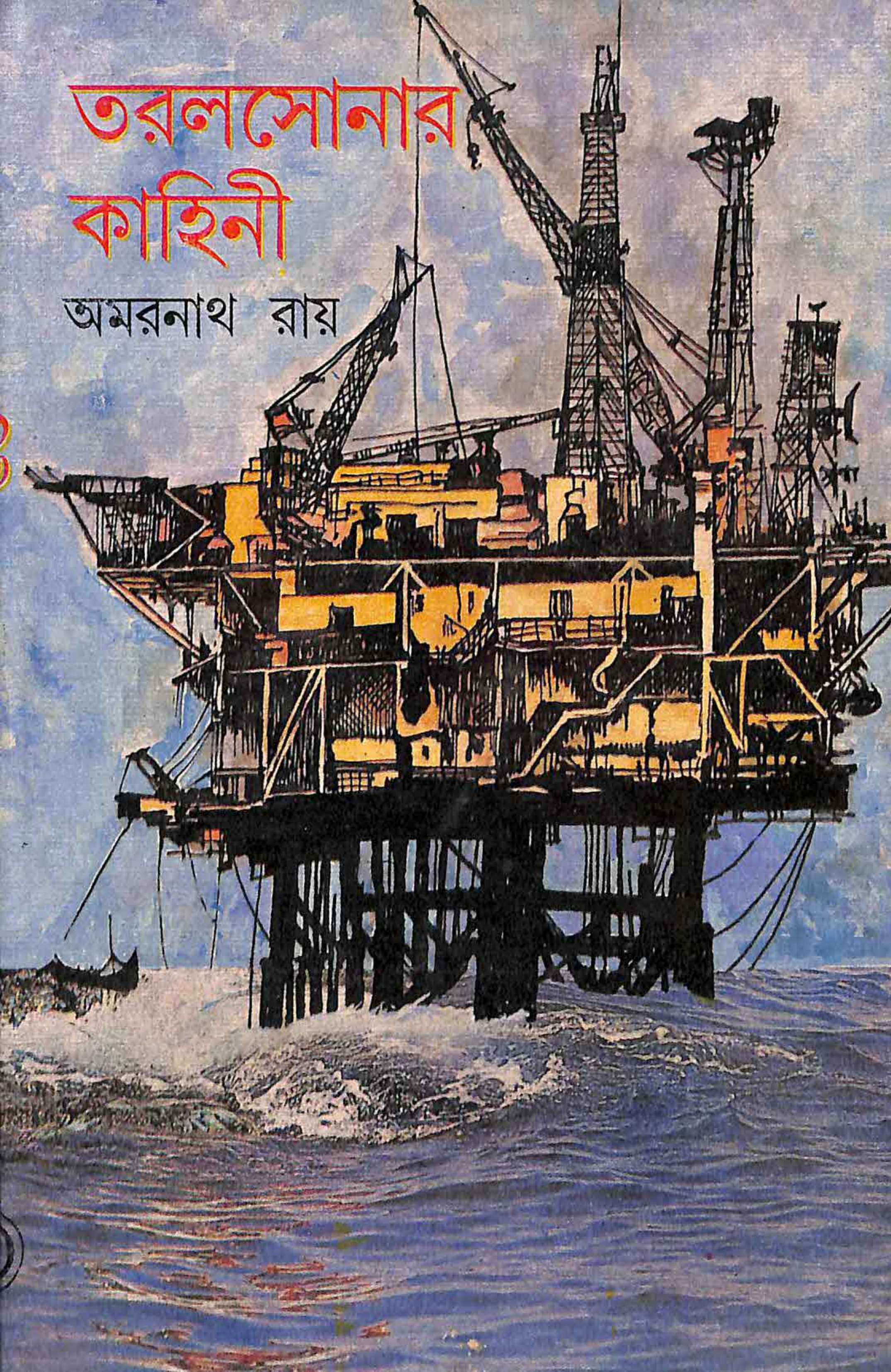
# তরলসোনার কাহিনী

অমরনাথ রায়



# তরল সোনার কাহিনী

# তরল সোনার কাহিনী

অমরনাথ রায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
—বৈশাখ, ১৩৯৮
—এপ্রিল, ১৯৯১



প্রকাশক
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর
অশোক চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৬

দাম : ১৫ টাকা
Rupees Fifteen Only

আমার বড় দাদু ভাই
সুচেতা মুখোপাধ্যায়

ও

ছোট দিদু ভাই
অর্জয়িতা রায়ের
হাতে
স্নেহভরে তুলে দিলাম এই বই।

দাদু

## লেখকের অন্যান্য বই

বিশ্বের কৃতী বিজ্ঞানী
বিচিত্র বিজ্ঞান
রসায়নের রসালো গল্প
বিজ্ঞানের খোশগল্প
আকস্মিক আবিষ্কারের গল্প
বিশ্বের বিজ্ঞানী
দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী
বিজ্ঞানের খেলা
দেশ-বিদেশের জীবজন্তু
স্টুডেন্টস্‌ সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া
জ্ঞান-বিজ্ঞানের গল্প ( রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত )
ভারত আমার ( ইউনেস্কো পুরস্কারপ্রাপ্ত )
বঙ্গ আমার ( ইউনেস্কো পুরস্কারপ্রাপ্ত )
সব পেয়েছির দেশ ( ইউনেস্কো পুরস্কারপ্রাপ্ত )
রসায়ন ভারতী ( বাংলা ভাষায় রসায়ন বিজ্ঞানে একমাত্র অভিধান )

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আজ তোমরা ছোট বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। তোমরাও বড় হয়ে উঠবে। জানতে ও শিখতে চাইবে অনেক কিছুই। তোমাদের জানানো ও শেখানোর ভার ন্যস্ত আছে তোমাদের অভিভাবকদের, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর আমাদের মতো মানুষদের ওপর—যাঁরা ছোটদের জিজ্ঞাসু মনকে তৃপ্ত করতে কলম ধরেন।

এ বইয়ের নামটা শুনেই চমকে উঠবে জানি। ভাববে 'তরল সোনা' আবার এমন কি জিনিস, যা নিয়ে এই বই লেখা যায়। আমি কিন্তু কঠিন সোনার তরল অবস্থার কথা এ বইতে লিখিনি। তবে?—লিখেছি এমন এক তরল পদার্থের কাহিনী, যাকে বলা চলে সোনার মতই দামী। কিন্তু কি সেই তরল পদার্থ বল দেখি?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, সেই তরল পদার্থের নাম 'পেট্রোলিয়াম'—যা আমাদের রোজকার জীবনে কাজে লাগে এমন অজস্র দ্রব্যের মূল উপাদান।

এমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তরল পদার্থের কাহিনীই তোমাদের শুনিয়েছি এই গ্রন্থ 'তরল সোনার কাহিনী'তে। এ বই তোমাদের ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

**অমরনাথ রায়**

ফ্ল্যাট-সি· ১৯, ইউনিট-২
কালিন্দী হাউসিং এস্টেট
যশোহর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৮৯

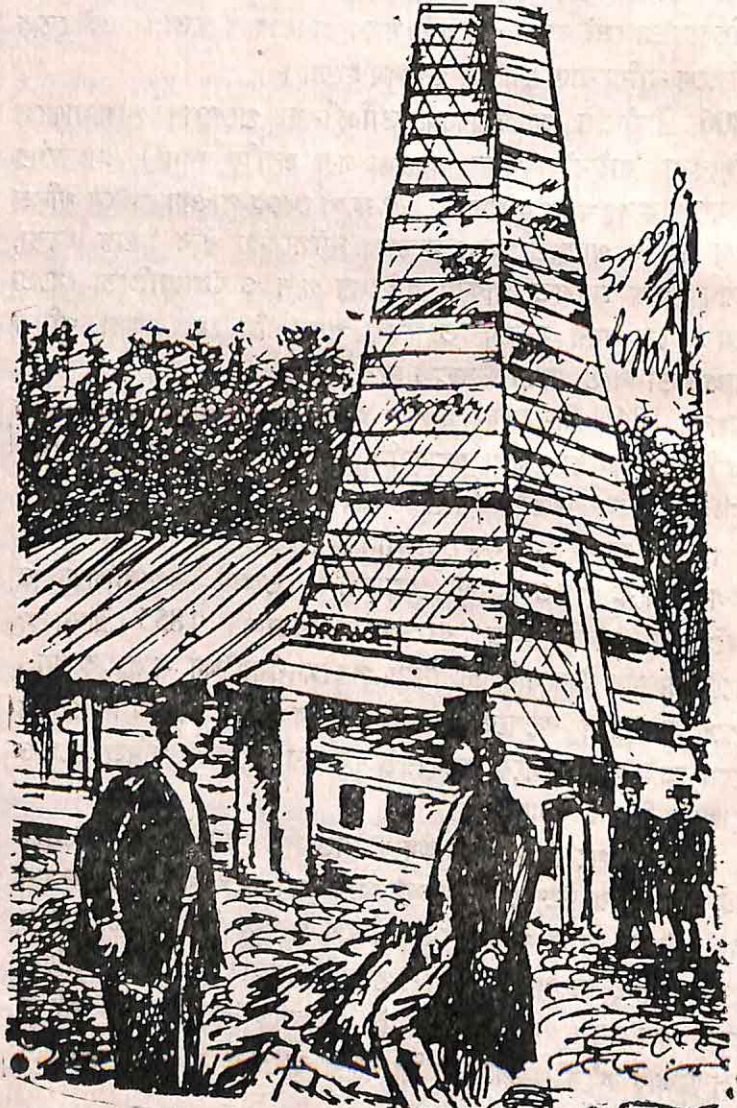
## ॥ এক ॥

ভূগর্ভ এক অফুরন্ত সম্পদের আকর। ভূগর্ভ থেকে আমরা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—এই তিন শ্রেণীর সম্পদই পেয়ে থাকি। ভূগর্ভের জল তুলে এনে আমরা পান করি, গৃহস্থালির কাজে লাগাই, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করি। ভূগর্ভ থেকে আহরণ করা কয়লা আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করি। ভূগর্ভে আছে অনেক মূল্যবান ধাতুর আকরিক। সেগুলি তুলে এনে ধাতু নিষ্কাশন ক'রে আমরা সেইসব ধাতুকে নানাভাবে কাজে লাগাই। ভূগর্ভ থেকেই আমরা পাই প্রাকৃতিক গ্যাস—জ্বালানি হিসাবে যার মূল্য অনেকখানি। আবার যে কেরোসিন তেলে বাতি জ্বলে, যে পেট্রোলে চলে মোটর গাড়ি ও উড়োজাহাজ, তার জন্মও ভূগর্ভে—খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়ম রূপে।

আধুনিক সভ্যতায় পেট্রোলিয়ম বা খনিজ তেলের অবদান অনেকখানি। আমাদের কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নানাভাবে পেট্রোলিয়মের ওপর নির্ভরশীল। তাই যুদ্ধ বা শান্তি—যে কোন সময়েই পেট্রোলিয়মের অভাবে জাতির জীবন বিড়ম্বিত হয়।

যদিও মাত্র 1859 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার পেনসিলভানিয়া অঞ্চলের 'তিতাসভিলে' নামক স্থানে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম তৈলকূপ খনন করা হয়,—এর বহুকাল আগে থাকতেই মানুষ পেট্রোলিয়ম ব্যবহার ক'রে আসছে। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই ভূপৃষ্ঠের ফাটলের ভেতর দিয়ে কালো রঙের অবিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ম ক্ষরিত

খনিজ তেল তোলার কাজে নিযুক্ত করলেন। ড্রেক আবার উইলিয়ম স্মিথ নামে এক দক্ষ কূপখননকারীকে এ কাজে তাঁকে সহায়তা করার জন্যে নিযুক্ত করলেন। ড্রেক, স্মিথ এবং স্মিথের দুই ছেলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রথম তৈলকূপটি খোঁড়া হলো 1859



খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে। বলতে গেলে তখনই সূচনা হলো পেট্রোলিয়ম শিল্পের।

॥ দুই ॥

পেট্রোলিয়ম দাহ্য তরল পদার্থ। এর প্রধান উপাদান হলো কতকগুলি হাইড্রোকার্বন যৌগ। কার্বন ও হাইড্রোজেন সহযোগে গড়া যৌগগুলিকে হাইড্রোকার্বন যৌগ বলা হয়। পেট্রোলিয়মে শতকরা 50 থেকে 98 ভাগ পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন যৌগ থাকে। পেট্রোলিয়মের অবশিষ্ট অংশ প্রধানত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন অথবা সালফার ঘটিত জৈব যৌগ দিয়ে গড়া।

ভূগর্ভে কি ভাবে পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে যে মতটি অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন, সেটি এইরকম ঃ

> সুদূর অতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নিম্নশ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় হয়তো মাটির নীচে বা সমুদ্রগর্ভে চাপা পড়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠের ওপরকার চাপ, ভূগর্ভের তাপ এবং নানারকম জীবাণুর ক্রিয়ায় তারা পেট্রোলিয়মে ও প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে।
>
> এই রূপান্তর ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। তবে কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ কোষে হাইড্রোকার্বন যৌগ থাকে। এই সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহ-কোষের অন্তর্গত হাইড্রোকার্বন যৌগগুলি থেকেই কালক্রমে পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন যে ভূগর্ভে সমাধিপ্রাপ্ত জৈব পদার্থ থেকে জীবাণুর ক্রিয়ায় অক্সিজেন, সালফার ও নাইট্রোজেন অপসারিত হ'য়ে হাইড্রোকার্বনযুক্ত পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি হয়েছে। এমনও হ'তে পারে যে উভয় গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীদের অনুমান সত্য। হয়তো বা একই সঙ্গে উভয় প্রক্রিয়াতেই পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি হ'য়ে থাকবে।

হ'তে দেখা গেছে। সম্ভবত তার থেকেই পেট্রোলিয়মের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে।

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে ঈশ্বর একবার নোয়াকে তাঁর জাহাজের তক্তার জোড়ের মুখগুলিতে পিচ লাগিয়ে জল নিরুদ্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই পিচ সম্ভবত অবিশুদ্ধ গাঢ় পেট্রোলিয়ম।

প্রায় ছ'হাজার বছর আগে পারস্য দেশের লোকেরা গৃহনির্মাণে গাঢ় ও অবিশুদ্ধ পেট্রোলিয়মকে মর্টার (mortar) হিসাবে ব্যবহার করতেন। স্থাপত্যবিদ্যা বিশারদেরা সে প্রমাণ পেয়েছেন। বিখ্যাত গ্রীক পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। তাঁর লেখা বিবরণ পড়ে জানা যায় যে—পারস্য দেশে সে যুগে অগভীর কূপ থেকে খনিজ তেল তোলা হতো। কূপ থেকে তোলা অবিশুদ্ধ তেল গাঢ় বাদামী রঙের ও দুর্গন্ধযুক্ত ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের অনেক জায়গাতেই ভূগর্ভের খনিজ তেল ক্ষরিত হ'য়ে ভূপৃষ্ঠের ওপরে আসতো। আপনা থেকেই তাতে আগুন লেগে যেতো। অগ্নি-উপাসক পারসিকেরা তাকে 'শ্বাশ্বত-অগ্নি' জ্ঞানে পূজা করতেন। এ ভিন্ন পারসিকেরা তীরের ফলায় জ্বলন্ত পিচ লাগিয়ে ধনুকের সাহায্যে সেই তীর নিক্ষেপ করতেন শত্রু সৈন্যদের দিকে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভেনিস দেশীয় পরিব্রাজক 'মার্কো-পোলো' চীন দেশের তখনকার সম্রাট কুবলাইখানের দরবারে যাওয়ার পথে পারস্য সাগর তীরবর্তী বাকুর তৈল খনিগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে, ঐ খনিজ তেল পানীয় হিসাবে বা খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের অনুপযোগী কিন্তু জ্বালানি হিসাবে খুবই ভাল। উটের দেহের ক্ষত নিরাময়ের জন্যে স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ খনিজ তেলকে ক্ষতস্থানে মলমের মতো ক'রে মাখিয়ে দিতো। বাকু বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তৈলখনিগুলির অন্যতম।

উত্তর আমেরিকার অভিযাত্রীদের অনেকেই ভূপৃষ্ঠের ওপরে খনিজ তেল ক্ষরিত হ'তে এবং জলের ওপর খনিজ তেল ভাসতে দেখেছিলেন। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই খনিজ তেল

গায়ে মালিশ করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই তেল মালিশে দেহের মাংসপেশীগুলি সতেজ হয় এবং দেহ কর্মঠ থাকে। উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে বসতিস্থাপনকারী মানুষেরা ভূপৃষ্ঠে ক্ষরিত হওয়া খনিজ তেলে বস্ত্রখন্ড ভিজিয়ে নিয়ে তা নিংড়ে তেল সংগ্রহ করতো এবং সেই তেল চড়াদামে বিক্রি করতো। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই তেল ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করতো। এই তেল মালিশে নাকি বাত রোগের উপশম হতো।

1806 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বণিকেরা 'ব্রাইন' ( খাদ্য লবণের গাঢ় জলীয় দ্রবণ ) আহরণের উদ্দেশ্যে কূপ খনন করতো। ঐ কূপ থেকে পাওয়া ব্রাইনে খনিজ তেল মিশে থাকতো বলে কূপের মালিকেরা খুব বিরক্ত হতো, কারণ তেল মিশ্রিত থাকায় ব্রাইনের গুণ ও উপযোগিতা যেতো কমে। সে সময় মানুষ ভাবতেই পারে নি যে, একদা খনিজ তেলের ভবিষ্যত এতো উজ্জ্বল হবে।

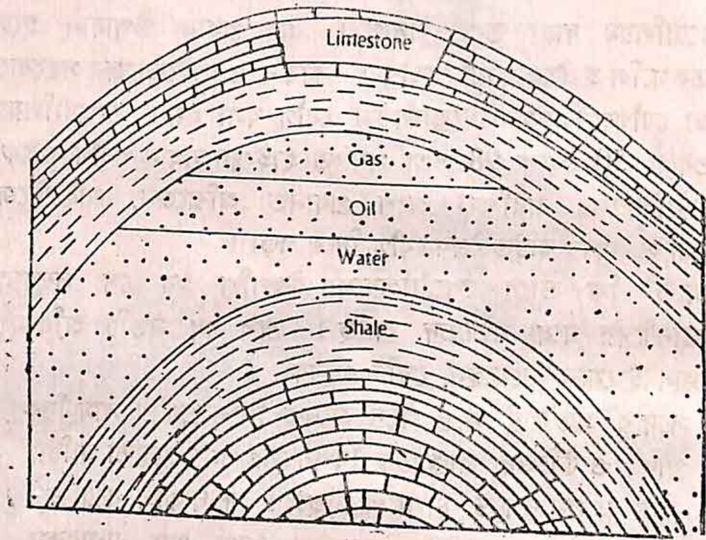
এরপর 1846 খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর 'আব্রাহাম গেসনার' নামে এক প্রযুক্তিবিদ কয়লা থেকে জ্বালানি তেল আহরণ করেন। সেই জ্বালানি তেল এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, শীঘ্রই ঐ তেল উৎপাদনের জন্যে একাধিক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়।

কয়লা থেকে পাওয়া এই জ্বালানি তেলের উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে কয়েকজন বিজ্ঞানী 1855 খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোলিয়মের উপযোগিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। অবশেষে ইয়েল কলেজের অধ্যাপক বেঞ্জামিন সিলিম্যান প্রমাণ করেন যে, কয়লা থেকে আহরিত তেলের মতোই খনিজ তেলও জ্বালানি হিসাবে ভাল।

এরপর পেট্রোলিয়মের কদর বাড়লো, চাহিদাও বাড়লো। ব্রাইন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবসায়ী কূপ খনন করেছিলেন এবং ব্রাইনের সঙ্গে খনিজ তেল মিশে থাকায় বিরক্ত হ'য়ে ব্রাইন সংগ্রহ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁরা এখন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন। তাঁরা এবার ঐ পরিত্যক্ত কূপ থেকে খনিজ তেল উদ্ধার ক'রে বাজারে বিক্রি ক'রে আগের লোকসান কিছুটা পুষিয়ে নিতে সচেষ্ট হলেন।

এই ব্যবসায়ীরা 'এডুইন ড্রেক' নামে এক ভদ্রলোককে ভূগর্ভস্থ

এই রূপান্তরক্রিয়া যেখানে ঘটেছিল, অনেক ক্ষেত্রে সেখান থেকে সাগর সরে এসেছে। আবার অনেক অঞ্চল এখনও সমুদ্রগর্ভে রয়েছে। তাই বর্তমান কালে স্থল ও জল—উভয় অঞ্চলেই তৈল কূপ খনন ক'রে পেট্রোলিয়ম তোলা সম্ভব হচ্ছে।




অধিকাংশ পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত থাকে মাটির নীচে বেলেপাথর আর চুনাপাথরের স্তরে। উপরে ও নীচে দু'টি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝে তরল পেট্রোলিয়ম আবদ্ধ থাকে। তার সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জলও সেখানে আবদ্ধ থাকে। তেল, জল ও গ্যাস—তিনটি পৃথক পৃথক স্তরে বিভক্ত হ'য়ে একত্রে অবস্থান করে। সবচেয়ে ওপরে থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস, ঠিক তার নীচে থাকে পেট্রোলিয়ম এবং সব নীচে থাকে জল। জলের ওপর তেল ভাসে, আর তেলের ওপর সঞ্চিত থাকে গ্যাস।

অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের চাপ প্রবল হ'লে পেট্রোলিয়ম বালুকাস্তর অথবা পাথরের ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে উৎপত্তিস্থল থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তারপর আবার সুবিধামতো শিলাস্তর খুঁজে পেলে সেখানে সঞ্চিত হয়। তা না হ'লে শিলাস্তরের ফাটল দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে উঠে আসে।

আবার কখনও কখনও ভূসংক্ষোভের ফলে হঠাৎ অত্যধিক পার্শ্বচাপ পেয়ে বিভিন্ন শিলাস্তর তরঙ্গায়িত হয়। এই রকম তরঙ্গায়িত শিলাস্তরের সবচেয়ে ওপরের অংশের নাম 'কুব্জ ভাঁজ' (anticline)। এই রকম কুব্জ ভাঁজের নীচে পৃথিবীর অধিকাংশ পেট্রোলিয়ম স্তর খুঁজে পাওয়া গেছে।

আবার ভূসংক্ষোভের ফলে অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের স্তরচ্যুতি ঘটে। স্তরচ্যুতি ঘটার ফলে অনেক সময় সচ্ছিদ্র বালুকাস্তরে অবস্থিত পেট্রোলিয়ম অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে এমনভাবে আট্‌কা পড়ে যায় যে, সেখান থেকে তার সরবার বা নড়বার আর কোন উপায়ই থাকে না। ভূগর্ভে উত্তাপ বেশি। বেশি উত্তাপে পেট্রোলিয়ম ক্রমশ গ্যাসে পরিণত হয়। যত বেশি গ্যাস সঞ্চিত হয়, ততই ভূপৃষ্ঠের ওপর তার চাপ প্রয়োগের মাত্রাও বাড়তে থাকে। গ্যাসের সেই চাপের ফলে কখনও কখনও ভূপৃষ্ঠের দুর্বল অংশে তুবড়ির মতো বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে ফাটল ধরে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে যেমন লাভা ও গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে, তেমনি এই ফাটল বেয়ে ভূগর্ভের খনিজ তেল, গ্যাস ও কাদামাটি তখন সজোরে ঊর্ধ্বে উঠে আসে।

আবার ভূগর্ভে সঞ্চিত গ্যাসের ওপরকার স্তরগুলি যদি পাললিক শিলা ও নরম মাটির হয়, তাহলে গ্যাসের চাপে মাটিসহ সেই শিলাস্তর উঁচু হ'য়ে ওঠে ও ঢিপির আকৃতি লাভ করে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের এই স্তরগুলির গ্যাসের চাপ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বেশি হলে বিস্ফোরণ ঘটে না এবং ভূ-পৃষ্ঠেরও কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। ঢিপির মতো আকৃতিবিশিষ্ট মাটির ঢিবিকে বলা হয় 'মাটির আগ্নেয়গিরি', ইংরাজীতে **Mud volcano.** রাশিয়ায় ভূপৃষ্ঠ হ'তে আড়াইশো ফুট পর্যন্ত উঁচু ছাদযুক্ত মাটির আগ্নেয়গিরি দেখা গেছে।

এই রকম 'মাটির আগ্নেয়গিরি' অনেক সময় সমুদ্রের তলদেশ থেকে জলের ওপর পর্যন্ত ঠেলে ওঠে। সমুদ্রের জলের আঘাতে এই রকম ঢিবির মাটি ক্রমশ গলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার ফলে ঢিবিটাও যায় চুপ্‌সে—অদৃশ্য হ'য়ে। আসামের লখিমপুর জেলার 'বড়গোলাই' নামক স্থানে একবার আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। 'আসাম অয়েল কোম্পানী'তেল আহরণের উদ্দেশ্যে সেখানে নলকূপ

বসান। সেই নলকূপ তেলের ভাঁড়ারে পেঁছানো মাত্রই পেট্রোলিয়ম এতো বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে যে, নলের মুখে পাম্প বসানো দুষ্কর হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া এতে প্রচুর তেল ও গ্যাসের অপচয় ঘটে। যাই হোক, কয়েকদিন অনেক চেষ্টার পর পাম্প বসানো সম্ভব হয় বটে, তবে মাত্র দু'মাসের মধ্যেই সেখানকার তেলের ভাঁড়ার নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তাতে তেল কোম্পানীর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।

'শেল' নামে কর্দমজাত একরকম পাললিক শিলা পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। এই 'শেল' তৈলবাহী হ'লে তা থেকেও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়। তৈলবাহী শেল গাঢ় পাটকিলে রঙের হয়। কঠিন মনে হ'লেও শেল কিন্তু মোমের মতো নরম ও ছুরি দিয়ে কাটা যায়। ভূগর্ভে 'শেল' কয়লার মতো স্তরে স্তরে সাজানো থাকে।

পেট্রোলিয়ম উদ্ধারের জন্যে প্রথমে শেলকে গুঁড়ো ক'রে ফেলা হয়। তারপর শেল চূর্ণকে বায়ুর অনুপস্থিতিতে একটি চুল্লীতে অধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয়। তার ফলে শেল-এর রাসায়নিক বিয়োজন ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'অন্তর্ধূম পাতন'। শেল-এর অন্তর্ধূম পাতনে পাওয়া যায় প্রধানত তেল—যে তেল 'শেল-অয়েল' নামে পরিচিত। শেল-অয়েল ছাড়াও শেল-এর অন্তর্ধূম পাতনে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ। শেল থেকে পাওয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস সালফিউরিক অ্যাসিডে শোষণ করিয়ে 'অ্যামোনিয়াম সালফেট' নামক সার উৎপাদন করা হয়। স্কটল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ অঞ্চলে শেল থেকে এইভাবে জ্বালানি তেল নিষ্কাশন করা হয়। আমেরিকার 'কলেরাডো' অঞ্চলে শেল প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। এর থেকে তেল নিষ্কাশনের সম্ভাবনাও সেখানে উজ্জ্বল।

## ॥ তিন ॥

কূপ খনন ক'রে ভূগর্ভ থেকে পেট্রোলিয়ম তুলে আনা হয়। কিন্তু কূপ খনন করার আগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, সে জায়গায় তেল আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা শিলার

গঠন অনুশীলন ক'রে অনুমান করতে পারেন—সেই শিলাস্তরের নীচে খনিজ তেল আছে কিনা।

সাধারণত কুব্জ ভাঁজ যুক্ত শিলাস্তরের নীচে খনিজ তেল সঞ্চিত থাকে। কিন্তু এই কুব্জ ভাঁজের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক হিসাব-নিকাশ আগে থাকতে ক'রে নিতে না পারলে কূপখনন বিফল হয়। শেষ পর্যন্ত তেলের ভাঁড়ারে পেঁছানো যায় না। কোথাও 'মাটির আগ্নেয়গিরির' সন্ধান পেলেও বুঝতে হয় যে তার নীচে খনিজ তেল সঞ্চিত আছে। আবার কোথাও পাথরের ফাটল দিয়ে তেল কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাস বেরুতে দেখলেও সে জায়গায় পেট্রোলিয়মের কূপ আছে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র এই বাহ্যিক লক্ষণগুলি দেখে অনুমান ক'রে ভূতত্ত্ববিদেরা ক্ষান্ত থাকেন না। তাঁরা আরও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ভূগর্ভের শিলাস্তরের প্রকৃতি অনুশীলন ক'রে ভূগর্ভে খনিজ তেলের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে সচেষ্ট হন।

ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তর-এর বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করা সহজ ব্যাপার। কিন্তু ভূগর্ভের শিলাস্তরের গঠন ও প্রকৃতি ভূপৃষ্ঠ থেকে বোঝা



সহজসাধ্য নয়। সেজন্যে ভূবিজ্ঞানীরা প্রথমে মাটির একটু নীচে

কিছু বিস্ফোরক পদার্থ ( ডিনামাইট ) রেখে যান্ত্রিক উপায়ে তাতে বিস্ফোরণ ঘটান। তার ফলে মৃদু ভূকম্পন সৃষ্টি হয়। এই ভূকম্পনের ফলে সৃষ্ট কম্পন-তরঙ্গ ভূগর্ভের বিভিন্ন প্রকার শিলাস্তরে প্রতিফলিত হ'য়ে ভূপৃষ্ঠে রাখা 'জিয়োফোন' যন্ত্রে ধরা পড়ে। যন্ত্রের পাঠ থেকে তা অনুশীলন ক'রে ভূবিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন—ভূগর্ভের শিলাস্তরগুলির প্রকৃতি কেমন, সেখানে তৈলবাহী শিলাস্তর আছে কিনা।

আবার 'টর্সন ব্যালান্স' ( Torsion balance ), গ্র্যাভিমিটার ( Gravimeter ) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শিলাস্তরের ওপর প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণ বল মেপে, তা থেকে শিলাস্তরগুলির ঘনত্বের তারতম্য এবং সর্বোপরি ভূগর্ভের শিলাস্তরের গঠন ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারেন।

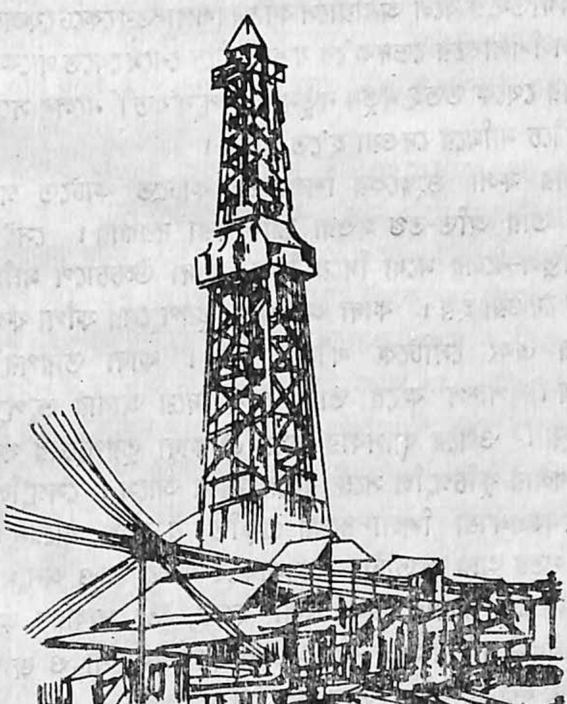
আবার ভূগর্ভে বিভিন্ন প্রকার শিলার অবস্থানের জন্যে ভূগর্ভের বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের তারতম্য ধরা পড়ে। তা থেকে ভূবিজ্ঞানীরা ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের প্রকৃতি অনুধাবন ক'রে খনিজ তেলের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারেন॥

ভূতাত্ত্বিকরা এই সব পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা ক'রে কোথায় পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত আছে সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নিয়ে তৈলকূপ খোঁড়ার কাজে হাত দেন।

ভূগর্ভের যেখানে পেট্রোলিয়ম সঞ্চিত থাকে তাকে বলা হয় পেট্রোলিয়মের খনি, আর তার উপরিভাগকে বলা হয় 'তৈল ক্ষেত্র'। তেল তোলার জন্যে নলকূপ বসানো খুবই ব্যয়সাধ্য কাজ। প্রভূত অর্থ ব্যয় ক'রে নলকূপ বসালেই যে তেল পাওয়া যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ, নানারকম প্রাকৃতিক কারণে ভূগর্ভস্থ খনিজ তেল স্থান পরিবর্তন করে, উৎপত্তিস্থল থেকে অনেক সময় অনেকটা দূরে সরে যায়। সে ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় ও শ্রম বিফলে যায়। তৈলানুসন্ধানে এই রকম নিষ্ফল প্রচেষ্টার নাম 'ওয়াইল্ড ক্যাটিং' ( wild catting )। তৈলানুসন্ধানের শতকরা নব্বুইটি প্রচেষ্টাই 'ওয়াইল্ড ক্যাটিং'-এর পর্যায়ে পড়ে। তবুও তৈলানুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া হয়, কারণ অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা সফল হ'লে পরে লোকসানটা অল্পদিনের মধ্যেই পুষিয়ে যায় এবং তারপর ধীরে

ধীরে লাভের অংকটা বাড়তে থাকে। কাজেই তৈলানুসন্ধানের কাজে আর্থিক ঝুঁকি নিতে হয়। যাঁরা এ কাজ করেন, তাঁদের যেমন অর্থবল থাকা দরকার, তেমনি দরকার মনোবল থাকা।

খনিজ তেল আহরণের উদ্দেশ্যে কূপ খননের প্রথম ধাপে তৈলক্ষেত্রের ওপর ইস্পাতের কাঠামোযুক্ত একটি উঁচু টাওয়ার ( tower ) নির্মাণ করা হয়। এই টাওয়ারের নাম 'ডেরিক'। ডেরিকের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থানে একটি প্রশস্ত 'প্লাটফরম' ( Platform ) নির্মাণ করা হয়। ডেরিকের এই 'প্লাটফরম' থেকে 'ড্রিলিং'-এর যন্ত্রপাতি কূপের ভেতরে নামানো বা ওঠানোর কাজ পরিচালনা করা হয়। 'ডেরিক' কখনও কখনও সাত-আট তলা অট্টালিকার সমান উঁচু হ'য়ে থাকে।



আজকাল 'রোটারি ড্রিলিং' (Rotary drilling) পদ্ধতিতে নলকূপ খোঁড়া হয়। প্রথমে ফাঁপা একটি ড্রিল-নলের আগায় তুরপুন-এর

ফলা লাগানো হয়। 'কেলি' ( kelly ) নামক একটি নলের সঙ্গে ড্রিল-নলের অপরপ্রান্ত যুক্ত করা হয়। ঘুরতে সক্ষম এমন একটি রোটারি টেব্‌ল ( Rotary table ) এর সঙ্গে কেলি যুক্ত থাকে। এঞ্জিনের সাহায্যে 'রোটারি টেব্‌ল' ঘোরানো হয়। এর ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে কেলি'র সঙ্গে যুক্ত ড্রিল-নলটিও ঘুরতে থাকে। ড্রিল-নলের আগায় লাগানো তুরপুনের ফলাও সেই সঙ্গে মাটি খুঁড়ে নীচে নামতে থাকে।

কাঠ-মিস্ত্রিরা তুরপুন দিয়ে যে ভাবে কাঠ ছেঁদা করে, এই ড্রিলও অনেকটা সেইরকমভাবে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে নীচে নেমে যেতে থাকে। এ কাজে যে তুরপুন ব্যবহার করা হয়, তা ইস্পাত দিয়ে তৈরি বলে খুব মজবুত এবং বেশ বড়সড় ও ভারী। তার আগাটা ধারালো দাঁতযুক্ত বলে অনায়াসে কঠিন শিলাস্তর কেটে ফেলতে পারে। ড্রিল-নল শিলাস্তর ভেদ ক'রে যতই নীচে নেমে যেতে থাকে, ডেরিক-এর ওপর থেকে ততই নতুন নতুন নল পূর্ববর্তী নলের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে নীচে নামিয়ে দেওয়া হ'তে থাকে।

তুরপুনের ফলা ভূত্বকের শিলাস্তর কাটতে কাটতে গরম হ'য়ে ওঠে। তার অতি-তপ্ত হওয়া রোধ করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা ড্রিল-নলের মধ্যে দিয়ে কিছু কাদা উচ্চচাপে মাটির নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাদা অবশেষে তুরপুনের ফাঁপা ফলায় গিয়ে পেঁছায় এবং সেটিকে শীতল করে। কাদা তারপর ভূগর্ভে পেঁছায়। পাম্প ক'রে তাকে চাপ দিয়ে আবার ভূপৃষ্ঠে তুলে আনা হয়। ওপরে আসবার সময় ঐ কাদা তুরপুনের ফলা দ্বারা কাটা শিলার কুচিগুলি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। সেগুলি পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানীরা শিলাস্তরের প্রকৃতি বুঝতে পারেন। খনিজ তেলের স্তর আর কতোটা নীচে থাকতে পারে তাও অনুমান করতে পারেন। যে কাদার কথা বলা হলো, তা সাধারণ কাদা নয়। বিভিন্ন রকম মাটির সঙ্গে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য ও জল মিশিয়ে ঐ বিশেষ ধরনের কাদা তৈরি করে নেওয়া হয়।

তেলের স্তরে পেঁছুবার আগে নলকে জলবাহী অনেক ভূ-স্তর অতিক্রম করতে হয়। ঐ সময় নলের ফাঁক দিয়ে জল চুঁইয়ে নীচে নেমে গেলে সেই জলের ওপর খনিজ তেল ভেসে উঠে অন্যত্র সরে যায়। তাতে অনেক লোকসান হয়। এই রকম লোকসান প্রতিরোধ

করবার জন্যে মূল নলের চেয়ে বেশি ব্যাসের একটি ইস্পাতের নল মূল ড্রিল-নলের বাইরের দিকের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। মূল ড্রিল নলের এই বহিরাবরণকে বলা হয় 'কেসিং' ( casing )। আর একটি বিশেষ ধরনের নল কেসিং-এর মধ্যে দিয়ে তেলের স্তর পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়। এই নল দু'টির মধ্যবর্তী স্থান সিমেণ্ট ঢেলে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। তখন এক ফোঁটা জলও নীচে নেমে যেতে পারে না। তাছাড়া তেলের ভাঁড়ারে পেঁছানোর পর এই দ্বিতীয়োক্ত নল বেয়েই তেল ভূপৃষ্ঠে উঠে আসতে পারে।

তেল তোলার নলের ওপরের মুখে লাগানো থাকে 'ভাল্ভ' ও 'মিটার'। নলের মধ্যে দিয়ে তেলের প্রবাহ আয়ত্বাধীন রাখা হয় ভাল্ভের সাহায্যে। আর নলের মধ্যে দিয়ে তেলের প্রবাহের পরিমাপ করা হয় 'মিটার' দ্বারা। নতুন খোঁড়া কূপের মধ্যে থেকে তেল স্বাভাবিক চাপেই ওপরে উঠে আসে। কিন্তু কখনও কখনও চাপ হ্রাস পায় বলে পাম্প-এর সাহায্যে তেলকে ওপরে টেনে তুলে আনতে হয়।

ভূপৃষ্ঠে নলের ওপরে 'সেপারেটার' (separator) যন্ত্র লাগানো থাকে। এই যন্ত্র গ্যাস থেকে তেলকে পৃথক ক'রে দেয়। গ্যাসমুক্ত তেলকে এরপর অন্য একটি নলপথে চালিত ক'রে বিরাট বিরাট ট্যাঙ্কে ভ'রে রাখা হয়। এই সব ট্যাঙ্ক থেকেই অবিশুদ্ধ বা ক্রুড পেট্রোলিয়ম নলপথে বন্দরে অথবা তৈলশোধনাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বন্দর থেকে জাহাজ যোগে সেই তেল অন্যত্র চালান দেওয়া হয়। আর তৈল শোধনাগারে অবিশুদ্ধ পেট্রোলিয়মকে শোধন ক'রে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারোপযোগী করা হয়। আবার তৈলকূপ থেকে উঠে আসা প্রাকৃতিক গ্যাসও সংগ্রহ ক'রে রেখে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়।

হ্রদ বা সাগরের গর্ভেও তেল থাকতে পারে,—থাকেও। সেক্ষেত্রে হ্রদ বা সাগরের বুকে ডেরিক ও প্ল্যাটফরম নির্মাণ ক'রে সেখান থেকে জলের নীচে ড্রিলিং প্রক্রিয়ায় নলকূপ বসানো হয় এবং পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ম ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ করা হয়।

তৈলকূপ ও শোধনাগার সাধারণত একই জায়গায় পাশাপাশি থাকে না। শোধনাগার নির্মাণ করা হয় এমন জায়গায়, যেখান থেকে

শোধিত তেল বাজারে বিক্রির জন্যে সহজে পাঠানো যায়। অনেক সময় তৈলকূপ ও শোধনাগারের মধ্যে শত শত মাইলের ব্যবধান থাকে। আবার শোধনাগার থেকে বাজারে শোধিত তেল পাঠাতেও শত শত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। পাইপ লাইন স্থাপন ক'রে স্থান হ'তে স্থানান্তরে তেল পাঠান হয়। কেবলমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রায় দু'লক্ষ মাইল দীর্ঘ তেলের পাইপ লাইন আছে। জলপথে তৈলবাহী জাহাজে এবং স্থলপথে রেল ও ট্রাকে ক'রেও তেল চালান দেওয়া হয়। এ ট্রাক—সাধারণ মালবাহী ট্রাক নয়, তৈলবাহী ট্যাঙ্কযুক্ত ট্রাক।

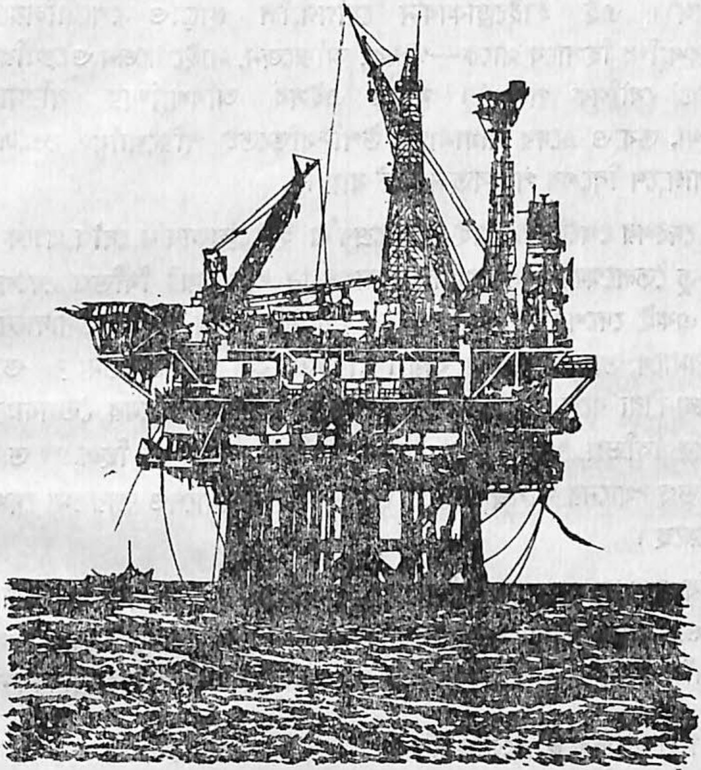
॥ চার ॥

পেট্রোলিয়ম উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। পেট্রোলিয়ম-সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া, রুমানিয়া, নাইজেরিয়া, ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব, নেদারল্যান্ড, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, কিউবা, আলজিরিয়া ও আর্জেণ্টিনা অন্যতম।—এ ভিন্ন পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই পেট্রোলিয়ম উৎপন্ন হয়, তবে পরিমাণে কম।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও পেট্রোলিয়ম উৎপাদিত হয়, তবে উৎপাদনের পরিমাণ দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় অনেক কম। 1890 খ্রীষ্টাব্দে আসামের ডিগবয়-এ প্রথম সার্থক তৈল-কূপ খনন করা হয়। ভারতে খনিজ তৈল শিল্পের সূত্রপাত হয় তখন থেকেই। এরপর ভারতে একে একে আরও অনেকগুলি তৈল-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। সেগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত নাহারকাটিয়া ও মোরান তৈলক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য।

1958 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের অধীনে গঠিত হয় 'তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন' (O.N.G.C)। খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন এই কমিশন। এঁদের প্রচেষ্টায় আঙ্কলেশ্বরে এবং ক্যাম্বে অঞ্চলে তৈলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে। বম্বে-হাই অঞ্চলে সমুদ্রগর্ভের সার্থক তৈল-ক্ষেত্র আবিষ্কারও এই কমিশনের অন্যতম কৃতিত্ব। দেশের বিভিন্ন

অঞ্চলে খনিজ তেলের অনুসন্ধান কার্য আজও অব্যাহত রেখেছে এই কমিশন।



ভারতের এই সব তৈলক্ষেত্র থেকে পাওয়া এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা অবিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ম শোধনের জন্যে ভারতে বেশ কয়েকটি তৈল-শোধনাগারও স্থাপন করা হয়েছে। সেই তৈল-শোধনাগারগুলি ডিগবয়, গৌহাটি, বারৌনি, বোম্বাই, কয়ালী (গুজরাট), বিশাখাপত্তনম ও হলদিয়ায় অবস্থিত। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে হয়তো আরও অনেক তৈলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হবে এবং আমাদের দেশ এই গুরুত্বপূর্ণ তৈল সম্পদে স্বনির্ভর হ'য়ে উঠবে। অবিশুদ্ধ বা ক্রুড পেট্রোলিয়ম প্রধানত কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের জটিল সংমিশ্রণে গঠিত। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে একটি সাধারণ মিল আছে। সেই মিলটি হলো—ঐ

পদার্থগুলির প্রত্যেকটিই এক-একটি হাইড্রোকার্বন। 'হাইড্রোকার্বন' হলো কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমবায়ে গড়া যৌগিক পদার্থ। এই হাইড্রোকার্বন যৌগগুলি ছাড়াও পেট্রোলিয়মে অবিশুদ্ধি হিসাবে থাকে—গন্ধক, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ক্লোরিন ঘটিত যৌগিক পদার্থ। যদিও এইসব অবিশুদ্ধির পরিমাণ নগণ্য, তবুও এদের সামান্যতম উপস্থিতিতেই পরিশোধিত তেলের গুণাগুণে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে যায়।

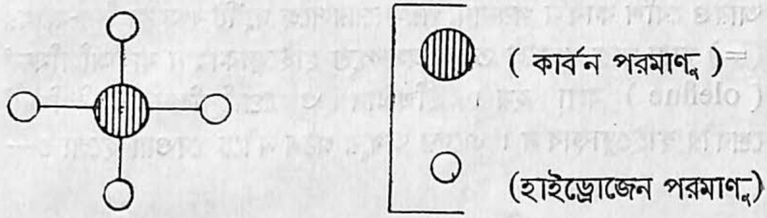
সব দেশের পেট্রোলিয়মেই তিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন যৌগ থাকে। কিন্তু তৈলক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন স্থানের পেট্রোলিয়মের সকল উপাদানের পরিমাণে তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু কেন এই তারতম্য?—ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সৃষ্টির আদিতে বিভিন্ন স্থানের তৈলবাহী স্তরে বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে ছিল। তাই বিভিন্ন স্থানের খনিজ তেলের উপাদানের পরিমাণেও তারতম্য দেখা দিয়েছে।

অবিশুদ্ধ বা ক্রুড পেট্রোলিয়মে যে তিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন যৌগ পাওয়া যায়, তারা হলো (১) অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন, (২) অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন এবং (৩) অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন।

**অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন:**

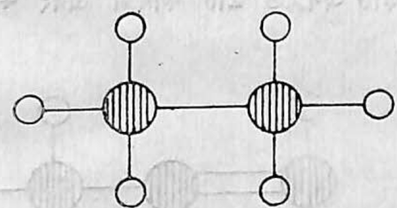
অ্যালিফ্যাটিক শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনদের 'প্যারাফিন' নামেও অভিহিত করা হয়। মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন ইত্যাদি অ্যালিফ্যাটিক বা প্যারাফিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন।
'মিথেন' একটি গ্যাস। এই হাইড্রোকার্বন গ্যাসের একটি অণুতে একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু রাসায়নিক-ভাবে যুক্ত থাকে। এক-একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এক-একটি

বণ্ড বা যোজক (—) দ্বারা কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। কাজেই একটি 'মিথেন' অণুর গঠন এই রকম ঃ



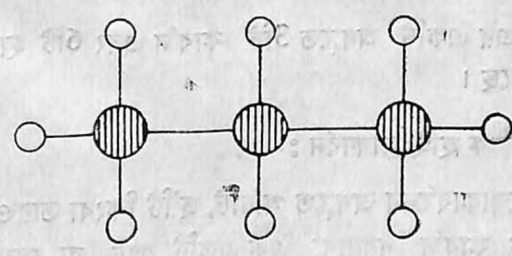

( মিথেন অণু )

'ইথেন' অণুতে দু'টি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে ছ'টি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রেও এক-একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এক-একটি বণ্ড বা যোজক দ্বারা এক-একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। একটি 'ইথেন' অণুর গঠন এই রকম ঃ



( ইথেন অণু )

অনুরূপভাবে একটি 'প্রোপেন' অণুর গঠন এই রকম ঃ

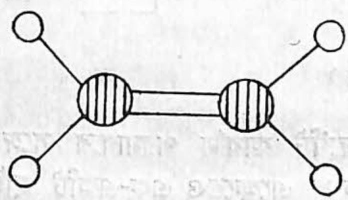


( প্রোপেন অণু )

এই সব হাইড্রোকার্বন যৌগে প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণু কার্বন

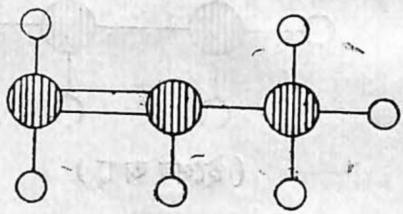
পরমাণুর সঙ্গে একটি মাত্র বণ্ড বা যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে বলে, এদের 'সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন' বা 'প্যারাফিন' বলা হয়।

কিন্তু এই রকম হাইড্রোকার্বন যৌগের অণুতে কোনও দু'টি বা আরও বেশি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে দু'টি বণ্ড বা দ্বি-বন্ধের (=) দ্বারা যুক্ত থাকলে তাকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা 'অলিফিন' ( olefine ) বলা হয়। ইথিলিন ও প্রোপিলিন—'অলিফিন' শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন। এদের অণুর গঠন নীচে দেওয়া হলো ঃ—



( ইথিলিন অণু )

ইথিলিন-এর একটি অণুতে 2টি কার্বন এবং 4টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে।



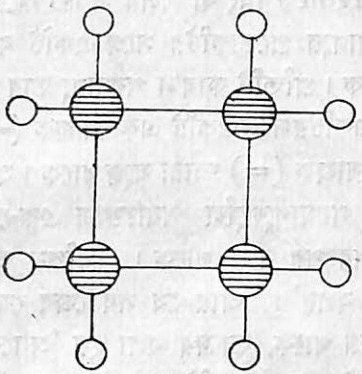
( প্রোপিলিন অণু )

প্রোপিলিন-এর একটি অণুতে 3টি কার্বন এবং 6টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে।

**অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন ঃ**

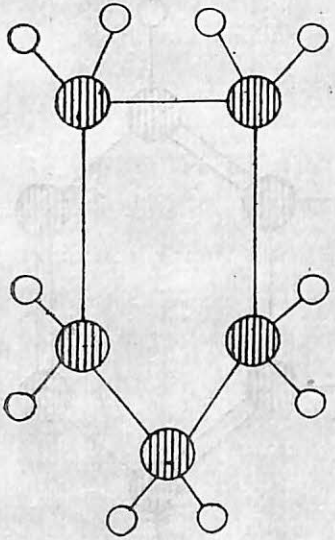
যে সব হাইড্রোকার্বনের অণুতে পাঁচটি, ছ'টি কিংবা তারও বেশি বা কম সংখ্যক কার্বন পরমাণু এক-একটি বণ্ড বা যোজক দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে রিং বা বলয়ের আকারে যুক্ত থাকে, তাদের বলা হয় অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন। সাইক্লোবিউটেন, সাইক্লোপেণ্টেন

ও সাইক্লোহেক্সেন—এই শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এদের অণুর গঠন নীচে দেওয়া হলো ঃ



( সাইক্লোবিউটেন অণু )

সাইক্লোবিউটেনের একটি অণুতে 4টি কার্বন ও 8টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে।



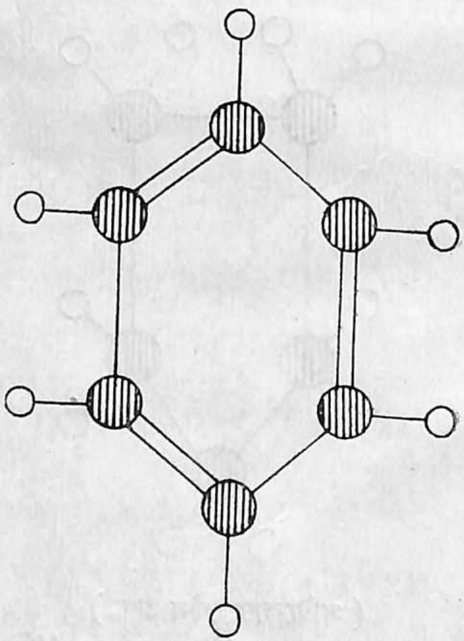
( সাইক্লোপেণ্টেন অণু )

একটি সাইক্লোপেণ্টের অণুতে 5টি কার্বন ও 10টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে।

অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন ঃ

'বেঞ্জিন' একটি হাইড্রোকার্বন যৌগ। বেঞ্জিনের একটি অণুতে 6টি

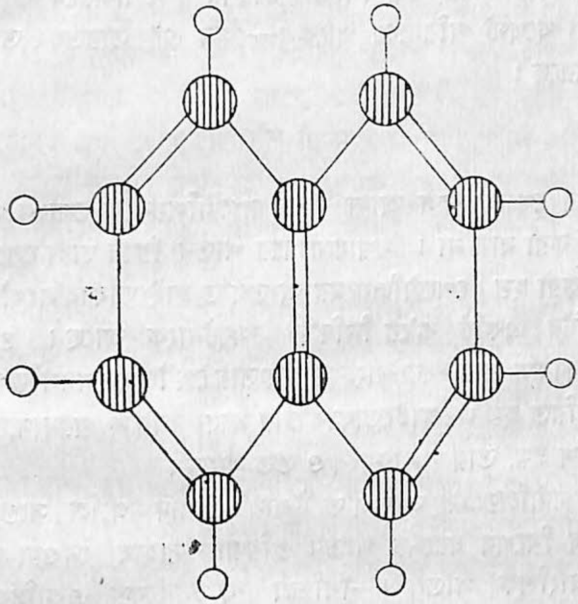
কার্বন এবং 6টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। বেঞ্জিন অণুর 6টি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একটি সুষম ষড়ভুজ (regular hexagon) রিং বা বলয় সৃষ্টি করে। বেঞ্জিন অণুর 6টি কার্বন পরমাণুর প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি ক'রে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। প্রতিটি কার্বন পরমাণু তার পার্শ্ববর্তী কার্বন পরমাণু দু'টির একটির সঙ্গে একটি এক-যোজক (—) এবং অপরটির সঙ্গে একটি দ্বি-যোজক (=) দ্বারা যুক্ত থাকে। ফলে বেঞ্জিন অণুর অন্তর্গত কার্বন পরমাণুগুলি পর্যায়ক্রমে এক-যোজক এবং দ্বি-যোজক দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। বেঞ্জিন অণুর এই গঠনকে বলা হয় 'বেঞ্জিন বলয়'। আর যে সব জৈব যৌগে অন্ততপক্ষে একটি বেঞ্জিন বলয় থাকে, তাদের বলা হয় 'অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন'। বেঞ্জিনই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন গোষ্ঠীর মূল যৌগ। সমস্ত অ্যারোমেটিক যৌগকে বেঞ্জিন সঞ্জাত যৌগ বলা হয়। নীচে দু'টি অ্যারোমেটিক যৌগের অণুর গঠন দেওয়া হলো ঃ—



(বেঞ্জিন অণু)

একটি বেঞ্জিন অণুতে 6টি কার্বন ও 6টি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে।

আগেই বলেছি যে বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়মে উপাদানগত তারতম্য দেখা যায়। একটি ন্যাপথ্যালিন অণুতে 10টি কার্বন ও 8টি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। যথা, ব্রহ্মদেশের পেট্রোলিয়মে কঠিন



( ন্যাপথ্যালিন অণু )

প্যারাফিন বেশি পরিমাণে আছে। তাছাড়া আছে অলিফিন এবং অ্যারোমেটিক গোষ্ঠীর হাইড্রোকার্বন যৌগ। নাইট্রোজেন আছে খুব কম পরিমাণে।

আসাম অঞ্চলের পেট্রোলিয়মে যথেষ্ট পরিমাণে পেট্রোল, ন্যাপথ্যালিন ও প্যারাফিন থাকে কিন্তু গন্ধক নেই বললেই চলে।

ইরানের তেলে প্যারাফিনের ভাগটা বেশি থাকে। কম থাকে ন্যাপথ্যালিনের ভাগ, অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন ও গন্ধকের ভাগ। এ দেশের পেট্রোলিয়ম থেকে খুব বেশি পরিমাণে পেট্রোল পাওয়া যায়।

আবার আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের খনিজ তেলে পেট্রোলের ভাগ খুব বেশি, বেশি নাইট্রোজেন ও গন্ধকের ভাগও। নাইট্রোজেন ও গন্ধক বেশি পরিমাণে থাকায় এখানকার পেট্রোলিয়ম শোধন করা কষ্টসাধ্য।

সোভিয়েট রাশিয়ার তেলে পেট্রোল ও বেঞ্জাইন খুব কম পরিমাণে থাকে। এ দেশীয় পেট্রোলিয়ম থেকে উৎকৃষ্টশ্রেণীর ডিজেল তেল ও পিচ্ছিলকারী তেল পাওয়া যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়মে উপাদানগত তারতম্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।—কেন এই তারতম্য, তা আগেই বলা হয়েছে।

## ॥ পাঁচ ॥

তৈলক্ষেত্র থেকে তুলে আনা ক্রুড পেট্রোলিয়মকে শোধন না ক'রে ব্যবহার করা যায় না। শোধনাগারে পাতন ক্রিয়া দ্বারা পেট্রোলিয়ম শোধন করা হয়। পেট্রোলিয়মের অন্তর্গত হাইড্রোকার্বন যৌগগুলির প্রত্যেকটির একটি ক'রে নির্দিষ্ট স্ফুটনাংক আছে। প্রত্যেকটি হাইড্রোকার্বন তার স্ফুটনাংকের উষ্ণতায় পেঁছুলে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। হাইড্রোকার্বনের মধ্যে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা যত বেশি হয়, তার স্ফুটনাংকও তত বাড়ে।

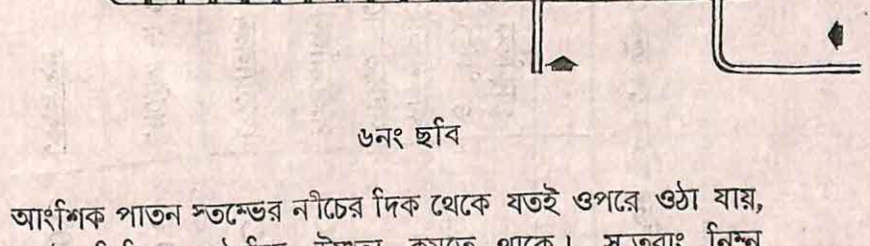
ক্রুড পেট্রোলিয়মের অন্তর্গত উদ্বায়ী উপাদানগুলি সংগ্রহ করার জন্যে যে বিশেষ ধরনের পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়, তার নাম 'আংশিক পাতন'।—বিভিন্ন স্ফুটনাংকের একাধিক তরল পদার্থের মিশ্রণকে বিভিন্ন উষ্ণতায় পাতন ক্রিয়া দ্বারা পৃথক করার প্রণালীকে আংশিক পাতন বলে।—এই রকম পাতন ক্রিয়ায় 'আংশিক পাতন স্তম্ভ' ( fractionating column ) ব্যবহার করা হয়।

নিম্ন স্ফুটনাংকের তরল বাষ্পে পরিণত হবার সময় উচ্চ স্ফুটনাংকের তরলও কিছু পরিমাণে বাষ্পে পরিণত হতে পারে। উচ্চ স্ফুটনাংকের তরল আংশিক পাতন স্তম্ভে শীতল হ'য়ে আবার পাতন পাত্রে পড়ে যায়। আর নিম্ন স্ফুটনাংকের তরল বাষ্পে পরিণত হ'য়ে হিমকারের ( Condenser ) আবেষ্টনে শীতল হ'য়ে পাতিত তরলে পরিণত হয় ও গ্রাহক পাত্রে সংগৃহীত হয়। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে আংশিক পাতন প্রক্রিয়াটি বোঝা সহজ হবে।

মনে করা যাক্,—একটি তরল মিশ্রণে ঈথার এবং বেঞ্জিন আছে। ঈথারের স্ফুটনাংক 35°C এবং বেঞ্জিনের স্ফুটনাংক 80°C.—এই

মিশ্রণটিকে পাতন পাত্রে নিয়ে উত্তপ্ত করলে 35°C উষ্ণতায় ঈথার বাষ্পীভূত হবে এবং হিমকারের আবেষ্টনে শীতল হ'য়ে ঘনীভূত হবে এবং তরল ঈথাররূপে গ্রাহক পাত্রে সঞ্চিত হবে। যতক্ষণ ঈথার বাষ্পীভূত হতে থাকবে, ততক্ষণ পাতন পাত্রের ভেতরকার উষ্ণতা 35°C এ স্থির থাকবে। সমস্ত ঈথার পৃথক হ'য়ে যাবার পর, আবার উষ্ণতা বাড়তে থাকবে এবং 80°C উষ্ণতায় বেঞ্জিন ফুটতে থাকবে এবং বেঞ্জিন বাষ্প হিমকারের আবেষ্টনে শীতল ও ঘনীভূত হ'য়ে তরল বেঞ্জিনরূপে গ্রাহক পাত্রে সঞ্চিত হবে। এমনিভাবে আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় ঈথার ও বেঞ্জিনকে তাদের মিশ্রণ থেকে পৃথক করা যায়।

তৈল শোধনাগারে ক্রুড পেট্রোলিয়ম পাতনের জন্যে একটি বিরাট আংশিক পাতন স্তম্ভের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠুরি তৈরি করা হয়। প্রত্যেকটি কুঠুরির মধ্যে যোগাযোগ রাখবার জন্যে বিশেষ ধরনের নল থাকে (৬নং ছবি)। স্তম্ভের নীচে একটি পাত্রে ক্রুড পেট্রোলিয়ম রাখা হয়। সেই পাত্রটিকে ঘিরে যে নল থাকে তার ভেতর উচ্চ তাপ ও চাপে স্টীম চালনা ক'রে পাত্রের ক্রুড পেট্রোলিয়মকে বাষ্পীভূত করা হয়। পেট্রোলিয়মের অন্তর্গত, হাইড্রোকার্বনগুলি তখন গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে স্তম্ভের ওপর দিকে উঠতে থাকে।



৬নং ছবি

আংশিক পাতন স্তম্ভের নীচের দিক থেকে যতই ওপরে ওঠা যায়, ততই বিভিন্ন কুঠুরির উষ্ণতা কমতে থাকে। সুতরাং নিম্ন স্ফুটনাংকের হাইড্রোকার্বনগুলি যথাক্রমে ওপরের দিকের কুঠুরিতে সঞ্চিত হ'তে থাকে এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্ফুটনাংকের হাইড্রো-কার্বনগুলি ক্রমান্বয়ে নীচের দিকের কুঠুরিতে ঘনীভূত হ'য়ে তরল

বিভিন্ন স্ফুটনাংকে ক্রুড পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতনজাত পদার্থের নাম ও ব্যবহার নীচে উল্লেখ করা হলো।

| স্ফুটনাংক | পাতিত অংশের নাম | ব্যবহার |
|---|---|---|
| 20°C পর্যন্ত | প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন, ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেনের মিশ্রণ)। এর সঙ্গে কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড ও হিলিয়াম মিশ্রিত থাকতে পারে। | রান্নার কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদন করা হয়। |
| 20°C—30°C | সাইমোজিন ও রিগোলিন | হিমায়ক যন্ত্রে ও বরফ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। |
| 30°C—70°C | পেট্রোলিয়ম ইথার | তেল ও চর্বির দ্রাবকরূপে এবং ড্রাই-ওয়াশে ব্যবহৃত হয়। |
| 70°C—120°C | পেট্রোল বা গ্যাসোলিন | মোটর গাড়ি ও বিমানের জ্বালানি রূপে, দ্রাবক রূপে এবং গরম জামা-কাপড় ড্রাই-ওয়াশ করতে ব্যবহৃত হয়। |
| 120°C—150°C | বেনজাইন | দ্রাবকরূপে ও পশমী কাপড় পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়। |

| | | |
|---|---|---|
| 150°C—300°C | কেরোসিন | আলো উৎপাদনে, জ্বালানি হিসাবে ও কয়েকটি কীটনাশক পদার্থের দ্রাবক রূপে ব্যবহৃত হয়। |
| 300°C-এর ঊর্ধ্বে | ভারী তেল ( ফুয়েল তেল, ডিজেল তেল ও গ্যাস তেল ) | চুল্লী ও ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয়। |
| 400°C-এর ঊর্ধ্বে পুনঃপাতন | (i) লুব্রিকেটিং তেল<br>(ii) তরল প্যারাফিন<br>(iii) ভেসোলিন<br>(iv) কঠিন প্যারাফিন বা মোম। | লুব্রিকেটিং তেল যন্ত্রাদি পিচ্ছিল করার কাজে ব্যবহৃত হয়। তরল প্যারাফিন ঔষধে জোলাপ রূপে ও মলম প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। ভেসেলিন মেশিনের যন্ত্রাংশ তৈলাক্ত করতে ও মলম প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। কঠিন প্যারাফিন প্রয়োজন হয় মোমবাতি, ওয়াটার প্রুফ কাগজ ও জুতার পালিশ প্রস্তুত করতে। |
| অবশেষ | পেট্রোলিয়ম পিচ ও অ্যাসফাল্ট। | রাস্তা তৈরি ও ছাদ মেরামতির কাজে ব্যবহৃত হয়। |

অবস্থায় সঞ্চিত হ'তে থাকে। বিভিন্ন কুঠুরি থেকে বিশেষ বিশেষ স্ফুটনাংকবিশিষ্ট তেলের অংশ ( হাইড্রোকার্বন যৌগ ) বের ক'রে আনা হয়।

ক্রুড পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতনের সময় তেলের কোন কোন হাইড্রোকার্বন উচ্চ উষ্ণতায় ও চাপে বিয়োজিত হ'য়ে গিয়ে গ্যাসের সৃষ্টি করে। সেই গ্যাস থেকে রাসায়নিক শিল্পের নানারকম উপাদান সংশ্লেষণ করা হয়।

ক্রুড পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতনজাত বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ব্যবহার অনুসারে একই অংশের বিভিন্ন রকম পরিশোধন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যে কেরোসিন দীপায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়, তার থেকে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন দূর করা দরকার। তা না করতে পারলে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, ভাল আলো পাওয়া যায় না। কিন্তু ট্র্যাক্টর বা অন্য কোন ইঞ্জিনে সেই কেরোসিন ব্যবহার করতে হ'লে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন দূর না করলেও চলে। সেক্ষেত্রে এই কেরোসিনই ভাল কাজ দেয়। 'এরেলিয়ানু' পদ্ধতিতে কেরোসিন থেকে অ্যারোমেটিক হাইড্রো-কার্বন দূর করা যায়। এই পদ্ধতিতে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের দূর করা হয়।

আবার লুব্রিকেটিং তেলে সাধারণত প্যারাফিন মোম থাকে। এই মোম লুব্রিকেটিং তেলে থাকলে এবং সেই তেল কোন যন্ত্রে ব্যবহার করলে, যন্ত্রপাতির গতি শিথিল হ'য়ে যেতে পারে। লুব্রিকেটিং তেলকে অতিরিক্ত শীতল করলে প্যারাফিন মোম কঠিন হ'য়ে থিতিয়ে পড়ে। তখন ফিল্টার প্রেসের সাহায্যে কঠিন প্যারাফিন মোম পৃথক ক'রে নেওয়া হয়। এ ভিন্ন প্রোপেন (তরল), ফারফিউর‍্যাল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রাবক লুব্রিকেটিং তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তা থেকে প্যারাফিন মোম পৃথক হ'য়ে পড়ে।

মোটর স্পিরিটে ( মোটর গাড়িতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি ) ও বিমানের জ্বালানিতে গন্ধক থাকলে ইঞ্জিনে ঐ তেল পুড়বার সময় সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং তা ইঞ্জিনের ক্ষয় সাধন করে। কাজেই মোটর গাড়ি ও বিমানের জ্বালানি থেকে

গন্ধককে দূর করা দরকার। এ কাজটি করা হয় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহায়তায়।

পৃথিবীতে প্রতি বছর যে পরিমাণ ক্রুড পেট্রোলিয়ম খনি থেকে তোলা হয়, তার শতকরা 45 ভাগই 'পেট্রোল' উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার প্রসার ঘটছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটায় মোটর গাড়ি ও বিমান চলাচল বেড়েছে। কলকারখানায় শক্তি জোগাতে এবং মোটরগাড়ি ও বিমান চালাতে জ্বালানি হিসাবে পেট্রোলের চাহিদাও দ্রুত বেড়ে চলেছে।

ক্রুড পেট্রোলিয়ম থেকে আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় পেট্রোল উৎপাদন করার সময় উচ্চ স্ফুটনাংকের কতকগুলি ভারি জ্বালানি তেল (হাইড্রোকার্বন) প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। সেগুলিকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে করতে বিজ্ঞানীরা এমন একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন ক'রে ফেললেন, যার দ্বারা উচ্চ স্ফুটনাংকের ভারি হাইড্রোকার্বন অণুগুলিকে ভেঙে নিম্ন স্ফুটনাংকের হাল্কা হাইড্রোকার্বন অণুতে পরিণত করা যায়। এই পদ্ধতির নাম ক্র্যাকিং (cracking) বা ভাঙন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে ভারি হাইড্রোকার্বন বিশিষ্ট তেল থেকে আরও কিছুটা 'পেট্রোল' পাওয়া যায়, কারণ 'পেট্রোল' হলো নিম্ন স্ফুটনাংক বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। বিভিন্ন পদ্ধতিতে পেট্রোলিয়মের 'ক্র্যাকিং' করা যায়। ভারি হাইড্রোকার্বন অণুতে উচ্চ তাপ ও চাপ প্রয়োগ করলে হাইড্রোকার্বন অণুর অন্তর্গত কার্বন পরমাণুগুলির বন্ড বা যোজক ভেঙে যায়। তার ফলেই উৎপন্ন হয় হাল্কা হাইড্রোকার্বন অণু। এই পদ্ধতির নাম 'থার্মাল ক্র্যাকিং' (Thermal cracking)। থার্মাল ক্র্যাকিং পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় 1912 খ্রীষ্টাব্দে। আজও এ পদ্ধতি চালু আছে।

আর এক রকম ক্র্যাকিং পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নাম ক্যাটালিটিক ক্র্যাকিং (Catalytic cracking)। ক্যাটালিস্ট (Catalyst) কথাটি থেকে 'ক্যাটালিটিক' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'ক্যাটালিস্ট' মানে অনুঘটক।—যে পদার্থ নিজে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ না ক'রে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে

দ্রুততর অথবা মন্থরতর করতে সাহায্য করে, সেই পদার্থটিকে বলা হয় অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট। ব্যবহৃত অনুঘটকের ভর ও রাসায়নিক গঠন, বিক্রিয়ার আগে যা ছিল—বিক্রিয়ার শেষেও তাই থাকে।

সিলিকা-অ্যালুমিনার সূক্ষ্ম চূর্ণকে অণুঘটকরূপে ব্যবহার ক'রে তার সঙ্গে পেট্রোলিয়ম বাষ্প মিশিয়ে 'রিয়্যাক্টরে' পাঠানো হয়। 'রিয়্যাক্টর' মানে বিক্রিয়া কক্ষ। সেখানে উচ্চ উষ্ণতায় রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। তার ফলে ভারি হাইড্রোকার্বন অণুগুলি ভেঙে গিয়ে হাল্কা হাইড্রোকার্বন অণুতে পরিণত হয়। এরই নাম 'ক্যাটালিটিক ক্র্যাকিং'। এই ক্র্যাকিং প্রক্রিয়ায় থার্মাল ক্র্যাকিং অপেক্ষা পেট্রোল বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্যবহৃত অনুঘটকটিকে বারবার ব্যবহার করা যায়। প্রতিবার ক্র্যাকিং-এর সময় নতুন ক'রে অণুঘটক যোগ করতে হয় না।

## ॥ ছয় ॥

মোটর গাড়ির ইঞ্জিন কি ভাবে চলে ?

এক কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, ইঞ্জিনের মধ্যে উদ্বায়ী তেল ও বায়ুর মিশ্রণের বিস্ফোরণ ঘটার ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তারই সাহায্যে ইঞ্জিন চলে। আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ব্যাপারটা।

মোটর গাড়ির ইঞ্জিনে একটি কুঠুরি আছে। সেখানে উদ্বায়ী তেল হ'তে উদ্ভুত গ্যাস এবং বায়ু মিশ্রিত হয়। একটি পিস্টন নেমে এসে ঐ গ্যাস-মিশ্রণে চাপ দেয়। ফলে গ্যাস-মিশ্রণ সংকুচিত হয়। গ্যাস-মিশ্রণ সংকোচনের শেষ সীমায় যেইমাত্র পৌঁছায়, তখনই ব্যাটারির সাহায্যে একটি তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের প্রভাবে গ্যাস মিশ্রণটি জ্বলে ওঠে এবং তার ফলে দহনজাত গ্যাসের চাপে পিস্টনটি ওপর দিকে উঠে যায়। আবার ঐ কুঠুরিতে গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রণ সঞ্চিত হয়। পিস্টন নেমে আসে এবং আগেকার প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ইঞ্জিনের মধ্যে এই ক্রিয়াগুলি পরপর ছন্দোবদ্ধভাবে ঘটতে থাকে। ফলে ইঞ্জিনের মধ্যেকার পিস্টনটিও ছন্দোবদ্ধভাবে একবার ওপরে

ওঠে, তারপর আবার নীচে নেমে আসে। আর তাতেই ইঞ্জিনটি স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকে।

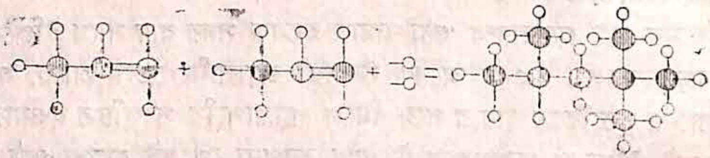
ইঞ্জিনের এই ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামায় অনেক সময় বাদ সাধে ইঞ্জিনে ব্যবহৃত তেল। এমন অনেক উদ্বায়ী জ্বালানি তেল আছে, যা ইঞ্জিনের কুঠুরিতে বায়ুর সঙ্গে মিশে পুরোপুরি সংকুচিত হওয়ার আগেই ইঞ্জিনের ভেতরকার উত্তাপে আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। —তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করার আগেই এই জ্বলন ঘটে। তার ফলে পিস্টনটি নীচের দিকের শেষ সীমায় পেঁছুবার সুযোগ পায় না। তার আগেই গ্যাস মিশ্রণে বিস্ফোরণ ঘটে গিয়ে দহনজাত গ্যাসের চাপে পিস্টন হঠাৎ ওপর দিকে উঠে যায়। এতে পিস্টনের ছন্দোবদ্ধ গতিতে বাধা পড়ে ও অনেক শক্তির অপচয় হয়। এ ছাড়া এর জন্যে ইঞ্জিনের মধ্যে ঝন্-ঝন্ শব্দ হয়।—মনে হয়, ইঞ্জিনের দহন-কুঠুরির দেয়ালে বুঝি হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বিস্ফোরণজনিত এই রকম শব্দ সৃষ্টি হওয়াকে 'নকিং' বলা হয়। 'নকিং' এর জন্যে ইঞ্জিনের সঞ্চালন ক্ষমতা অনেক ক'মে যায়। তাই যে জ্বালানির নকিং ধর্ম বেশি, সে জ্বালানি মোটর গাড়ির ইঞ্জিনে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার ফলে জেনেছেন যে, পেট্রোলের মধ্যেকার হাইড্রোকার্বনের আণবিক সংগঠনের সঙ্গে নকিং-এর কিছু সম্পর্ক আছে। যে সব হাইড্রোকার্বন অণু দীর্ঘশৃঙখলযুক্ত গঠনের হয়, তাদের নকিং ধর্মও বেশি হয়। অপরপক্ষে যে সব হাইড্রোকার্বন অণু শাখায়িত (branches) শৃঙখলযুক্ত গঠনের হয়, তাদের নকিং ধর্ম অপেক্ষাকৃত কম হয়।—এই তত্ত্বটি জানার পর বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ শৃঙখলযুক্ত হাইড্রোকার্বন অণুগুলিকে যতদূর সম্ভব শাখায়িত শৃঙখলযুক্ত হাইড্রোকার্বন অণুতে পরিণত ক'রে নকিং প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছেন।

'অ্যান্টিনক্' অর্থাৎ নকিং প্রতিরোধকারী হাইড্রোকার্বন তৈরির যে সমস্ত পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিনটি পদ্ধতি—

(i) পলিমেরিজেশন (ii) অ্যালকাইলেশন এবং (iii) আইসো-মেরিজেশন।

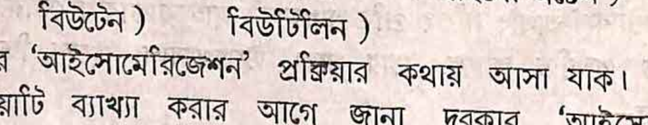
'পলিমেরিজেশন' প্রক্রিয়ায় দুই বা তার বেশি সমশ্রেণীভুক্ত দীর্ঘ শৃঙখলযুক্ত হাইড্রোকার্বন অণু (কিছু হাইড্রোজেনের সঙ্গে)

পরস্পর রাসায়নিকভাবে যুক্ত হ'য়ে অধিকতর কার্বন বিশিষ্ট



( আইসোবিউটিলিন ) + ( হাইড্রোজেন ) = ( আইসোঅক্টেন )।
2 অণু

শাখায়িত শৃঙ্খলযুক্ত হাইড্রোকার্বন অণুতে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, দু'টি 'আইসোবিউটিলিন' অণু পলিমেরিজেশন প্রক্রিয়ায় পরস্পর যুক্ত হ'য়ে একটি 'আইসো অক্টেন' অণুতে পরিণত হয়। 'আইসো অক্টেন' এর অ্যান্টিনক্ ক্ষমতা খুব ভাল। 'অ্যালকাইলেশন' প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর দু'টি হাল্কা হাইড্রোকার্বন অণু ( হাইড্রোজেন সংযোগ ব্যতিরেকেই ) পরস্পর সংযুক্ত হ'য়ে অধিক শাখা-প্রশাখা যুক্ত হাইড্রোকার্বন অণুতে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে—একটি 'আইসো-বিউটেন' অণু এবং একটি 'আইসোবিউটিলিন' অণু পরস্পর 'অ্যালকাইলেশন' প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হ'য়ে এক অণু 'আইসো-অক্টেন' উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াকারী ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থে সমান সমান সংখ্যক কার্বন পরমাণু থাকে।—আর আগেই বলা হয়েছে যে 'আইসো অক্টেন'-এর আদর্শ 'অ্যান্টিনক' ধর্ম বর্তমান।



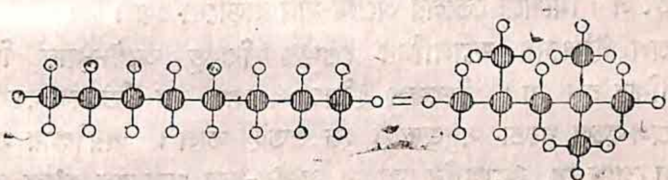
( আইসো- + ( আইসো- ( আইসো-অক্টেন )
বিউটেন ) বিউটিলিন )

এবার 'আইসোমেরিজেশন' প্রক্রিয়ার কথায় আসা যাক। এই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার আগে জানা দরকার 'আইসোমার' কাকে বলে।

একই আণবিক সংকেতযুক্ত একাধিক জৈব যৌগ থাকতে পারে। এদের আণবিক সংকেত এক হ'লেও গঠন-সংকেত, অর্থাৎ অণুতে উপস্থিত পরমাণুগুলির বিন্যাস বিভিন্ন হয়। এর ফলে এদের

ধর্ম ও প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়।—যে সব যৌগের অণু সমান সংখ্যক বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গড়া, অথচ সেই পরমাণুগুলির সংস্থান বিভিন্ন, অর্থাৎ যৌগগুলির গঠন সংকেত বিভিন্ন, তাদেরই 'আইসোমার' বলা হয়।

অক্টেন এবং আইসো-অক্টেন যৌগ দু'টি পরস্পরের 'আইসোমার।' কারণ উভয় যৌগেই সমান সংখ্যক কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। উভয় যৌগকেই একই আণবিক সংকেত $C_8H_{18}$ ( $C_8$ মানে 8 টি কার্বন পরমাণু এবং $H_{18}$ মানে 18 টি হাইড্রোজেন পরমাণু ) দ্বারা সূচিত করা যায়, কিন্তু উভয় যৌগের গঠন সংকেত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এদের প্রত্যেকটিতে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর সংস্থান বিভিন্ন, অর্থাৎ উভয় যৌগের গঠন-সংকেত বিভিন্ন।



( অক্টেন ) ( আইসো-অক্টেন )

অক্টেন অণু দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত গঠনের যৌগ, কিন্তু আইসো-অক্টেন অণু শাখায়িত শৃঙ্খলযুক্ত গঠনের। ফলে অক্টেন অপেক্ষা আইসো-অক্টেনের নকিং ধর্ম অনেক কম হয়। 'আইসোমেরিজেশন' প্রক্রিয়ায় তেলের দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত হাইড্রোকার্বন যৌগগুলিকে শাখায়িত শৃঙ্খলযুক্ত গঠনের আইসোমারে পরিণত ক'রে নকিং ধর্ম হ্রাস করা হয়।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে নকিং প্রতিরোধকারী ধর্ম-সম্পন্ন আদর্শ তেল হলো 'আইসো-অক্টেন'। আইসো-অক্টেনের 'অক্টেন মান' ধরা হয় 100, অপরপক্ষে নকিং প্রতিরোধকারী ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে 'হেপ্টেন' হলো নিকৃষ্টতম। তাই হেপ্টেনের 'অক্টেন-মান' ধরা হয় 0 ( শূন্য )। একশো ভাগের কতো ভাগ আইসো-অক্টেনের সঙ্গে বাকি হেপ্টেন মেশালে তার নকিং

ধর্ম পরীক্ষিত তেলের অনুরূপ হয় তা নির্ধারণ ক'রে সেই সংখ্যার সাহায্যে তেলের 'অক্টেন-মান' প্রকাশ করা হয়।

নানারকম পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, হাইড্রোকার্বন যৌগের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা যত বেশি হয়, তার স্ফুটনাংক তত কম হয় এবং 'অক্টেন-মান' তত বেশি হয়। অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের 'অক্টেন-মান' সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের অক্টেন-মানের চেয়ে বেশি হয়। জ্বালানি তেলের অক্টেন-মান যত বেশি হয়, তার নকিং ধর্মও তত কম হয়। তেলের অক্টেন-মান বেশি হ'লে গাড়িতে অল্প পরিমাণ তেল পুড়িয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। কাজেই মোটর গাড়ি ও বিমানের জন্যে উচ্চতর অক্টেন-মান যুক্ত জ্বালানি তেল ব্যবহার করা লাভজনক। পেট্রোলের অক্টেন-মান যত বেশি হয়, জ্বালানি তেল হিসাবে তার মূল্যও তত বেশি হয়। আজকাল পেট্রোলের সঙ্গে পরিমিত 'টেট্রা ইথাইল লেড' (সংক্ষেপে টি. ই. ল ) মিশিয়ে তেলের অক্টেন-মান বাড়ানো হয়।

ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানির শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু অক্টেন-মান দিয়ে নির্ধারিত হয় না। ডিজেল ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয় 'ডিজেল-তেল'। ডিজেল-তেল যতো সহজদাহ্য হয় ততই ভাল। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, জ্বালানি তেলের অক্টেন-মান খুব কম হ'লে তেল সহজদাহ্য হয়। অতএব ডিজেল তেলের অক্টেন-মান খুব কম হওয়া দরকার। তবেই তা আদর্শ ডিজেল তেল হিসাবে পরিগণিত হবে। ডিজেল তেল কতোটা সহজদাহ্য অর্থাৎ ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসাবে কতোটা ভাল, তা নিরূপণ করতে হ'লে ডিজেল তেলের 'সিটেন-মান' জানা দরকার।

'সিটেন' বা 'হেক্সা-ডিকেন' হলো একটা হাইড্রোকার্বন, যার একটা অণুতে আছে **16** টি কার্বন ও **34** টি হাইড্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ এক-অণু সিটেন-এর আণবিক সংকেত হলো $C_{16}H_{34}$.

পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, বিশুদ্ধ সিটেন-এর সিটেন-মান **100** এবং বিশুদ্ধ 'আলফা-মিথাইল-ন্যাপথ্যালিন'-এর সিটেন মান 0 ( শূন্য )। বিশুদ্ধ সিটেনের সঙ্গে বিশুদ্ধ 'আলফা-মিথাইল-ন্যাপথ্যালিন' বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে বিভিন্ন সিটেন-মান যুক্ত ডিজেল তেল প্রস্তুত করা হয় এবং বিভিন্ন রকম ডিজেল ইঞ্জিনে তা ব্যবহার করা হয়।

## ॥ সাত ॥

'পেট্রোলিয়ম' শব্দটির অর্থ 'পাথুরে তেল' (ল্যাটিন Petra মানে পাথর এবং Oleum মানে তেল )। মাটির তলার খনি থেকে এই তেল সংগৃহীত হয় বলে একে 'খনিজ তেল'ও বলা হয়।

খনিজ তেল থেকে আমরা অগণিত মূল্যবান জিনিস পাই। পেট্রোলিয়মজাত পদার্থগুলিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, ক্রুড পেট্রোলিয়মকে আংশিক পাতিত ক'রে পাওয়া যায় পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল তেল, প্যারাফিন, অ্যাসফাল্ট ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, পেট্রোলিয়মজাত কোন কোন পদার্থ থেকে রসায়নাগারে সংশ্লেষণ করে অগণিত রাসায়নিক দ্রব্য যথা, প্রোপিলিন থেকে অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোন থেকে মেসিটাইল অক্সাইড, ইথিলিন থেকে পলি-ইথিলিন বা পলিথিন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ক্রুড পেট্রোলিয়ম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে অসংখ্য জৈব ও কিছু অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সব রাসায়নিক দ্রব্যের সাধারণ নাম 'পেট্রোকেমিক্যাল'। পেট্রোলিয়ম শোধন করার সময় পাওয়া উপজাত পদার্থগুলি, বিশেষত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন-গুলি হ'তে সংশ্লেষণ করা অ্যালকোহল, কিটোন, ইথার, রঙ, ওষুধ, প্লাস্টিক, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম তন্তু ও নানারকম দ্রাবক 'পেট্রো-কেমিক্যাল' গোষ্ঠীর অন্যতম। পেট্রোলিয়মজাত এই সব রাসায়নিক দ্রব্য আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে ব্যবহার ক'রে থাকি।

এবার পেট্রোলিয়মজাত পদার্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

**প্রাকৃতিক গ্যাস :**

ভূগর্ভে প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস ও তরল পেট্রোলিয়ম প্রায়ই একসঙ্গে থাকে। কাজেই পেট্রোলিয়মের কথা বলতে গেলে প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা আপনা থেকেই এসে পড়ে।

প্রাকৃতিক গ্যাস কোন একক গ্যাস নয়, ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন দাহ্য গ্যাসের সংমিশ্রণ এটা। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো সরলতম হাইড্রোকার্বন 'মিথেন'। প্রধানত, মিথেনের দহনেই প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তাপ ও আলোক পাওয়া যায়। দহনে উদ্ভূত

তাপ শক্তির বিচারে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপযোগিতা যথেষ্ট। প্রতি ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালিয়ে 1000 বৃটিশ থার্মাল এককেরও বেশি তাপশক্তি পাওয়া যায়। আবার এই প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মোটর গাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী এক রকম জ্বালানি ( মোটর স্পিরিট ) তেল উৎপাদন করা যায়।

**পেট্রোলিয়ম গ্যাস ঃ**

ভূগর্ভ থেকে পেট্রোলিয়ম উত্তোলনের সময় তরল পেট্রোলিয়মের সঙ্গে কিছু পরিমাণ পেট্রোলিয়ম গ্যাসও নির্গত হয়। ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন ও আরও কয়েকটি উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন এই গ্যাসের উপাদান। চাপ ও শৈত্যের প্রভাবে এই গ্যাসের খানিকটাকে তরল অবস্থায় আনা যায়। তরল প্রোপেন ও বিউটেন 'গ্যাস-সিলিণ্ডারে' ভরে বাজারে বিক্রির জন্যে পাঠান হয়। সিলিণ্ডারের চাবি খুললেই এগুলি গ্যাসীয় অবস্হায় বেরিয়ে আসে বলে এদের সহজেই গৃহস্থালির কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পেট্রোলিয়ম গ্যাস স্বল্প পরিমাণ বায়ুর সঙ্গে জ্বালালে ভুসা (lamp black) উৎপন্ন হয়। এ দিয়ে ছাপাখানার কালি, জুতার কালি ইত্যাদি তৈরি হয়।

**পেট্রোলিয়ম ইথার ঃ**

পেট্রোলিয়মের উদ্বায়ী অংশকে সাধারণভাবে 'ন্যাপথা' নামে অভিহিত করা হয়। ন্যাপথাকে আংশিক পাতন করলে বিভিন্ন স্ফুটনাংক বিশিষ্ট তিনটি অংশ পাওয়া যায়। প্রথম অংশের নাম 'পেট্রোলিয়ম-ইথার', দ্বিতীয় অংশের নাম 'বেনজাইন' এবং তৃতীয় অংশের নাম 'পেট্রোল'।

পেট্রোলিয়ম ইথারের প্রধান উপাদান তিনটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন —পেণ্টেন, হেক্সেন ও হেপ্টেন। পেট্রোলিয়ম ইথার স্নেহ জাতীয় পদার্থের দ্রাবক হিসাবে এবং রঙ, বার্ণিশ ও এনামেল শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রাদি ড্রাই-ওয়াশ ( dry wash ) করতেও পেট্রোলিয়ম ইথার ব্যবহৃত হয়।

**বেনজাইন ঃ**

বেনজাইনের উৎস হলো 'ন্যাপথা'। দ্রাবক হিসাবে এবং গরম জামা কাপড় ড্রাই-ওয়াশ করতে 'বেনজাইন' ব্যবহৃত হয়।

**পেট্রোল বা গ্যাসোলিন ঃ**

ক্রুড পেট্রোলিয়মকে আংশিক পাতন ক'রে যে পেট্রোল পাওয়া যায়, তা দুর্গন্ধযুক্ত। তাই একে দুর্গন্ধমুক্ত করবার জন্যে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে সজোরে ঝাঁকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। তার ফলে অ্যাসিড ক্রমে থিতিয়ে পড়ে। তলানি থেকে ময়লা অ্যাসিড ও গাদ বের ক'রে নিয়ে পরপর কয়েকবার জল দিয়ে ধুয়ে তেল থেকে অ্যাসিড বের ক'রে দেওয়া হয়। এইভাবে দুর্গন্ধমুক্ত এবং অ্যাসিডমুক্ত করার পর পেট্রোলকে মোটর গাড়ি ও বিমানের জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। পেট্রোলও একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক। জামা কাপড় ড্রাইওয়াশ করতেও পেট্রোল ব্যবহৃত হয়।

**কেরোসিন ঃ**

ক্রুড পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতনের ফলে পাওয়া যায় কেরোসিন। কেরোসিন হাল্কা ও উদ্বায়ী তরল পদার্থ। পেট্রোলের মতো কেরোসিনকেও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে শোধন করা হয়। এতে ক'রে আলকাতরা জাতীয় পদার্থ, অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনগুলি ও সালফারঘটিত অবিশুদ্ধিগুলি দূর হয়। তার ফলে কেরোসিন তেলের রঙ ও গন্ধেরও উন্নতি হয়। বেশি পরিমাণে সালফার ঘটিত যৌগের উপস্থিতির ফলে তেলে দুর্গন্ধ হয়। এমন কেরোসিন তেল লণ্ঠনে ব্যবহার করলে লণ্ঠনের পাতলা ধাতব পাত্র তাড়াতাড়ি ফুটো হ'য়ে যায়। লণ্ঠনের পলতে তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় ও খুব বেশি ধোঁয়া হয়। এর ফলে লণ্ঠন থেকে কম আলো পাওয়া যায়। এই রকম কেরোসিন তেল তরল সালফার ডাই-অক্সাইড দিয়ে ধুয়ে শোধন ক'রে নিলে সালফার ঘটিত পদার্থ ও সেই সঙ্গে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থ দূর হয়।

কেরোসিন তেল আলো উৎপাদনে, জ্বালানি হিসাবে এবং ডি. ডি. টি., পাইরিথ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি কীটনাশক পদার্থের দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে গ্যাস-টারবাইন এবং জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসাবেও কেরোসিন তেল ব্যবহৃত হয়।

**ডিজেল তেল ঃ**

ক্রুড পেট্রোলিয়মে শতকরা 20 ভাগ ডিজেল তেল থাকে এবং ক্রুড পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতনের ফলে ডিজেল তেল পাওয়া যায়।

এই তেল কেরোসিন তেলের চেয়ে ভারি, কিন্তু লুব্রিকেটিং তেলের চেয়ে হাল্কা। অনেক লরি, বাস, রেল ইঞ্জিন—ডিজেল তেলে চলে। ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসাবে ডিজেল তেল ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ডিজেল ইঞ্জিনের জন্যে 40 থেকে 60 সিটেন-মান যুক্ত ডিজেল তেল ব্যবহার করা উচিত।

**লুব্রিকেটিং তেল ঃ**

ক্রুড পেট্রোলিয়মের আংশিক পাতনের ফলে পাওয়া যায় 'লুব্রিকেটিং তেল'। লুব্রিকেটিং তেলের সবচেয়ে বড় গুণ হলো সান্দ্রতা ( viscosity )। তেলের উপাদানে যে সব হাইড্রোকার্বন আছে, তাদের অণুর গঠনের ওপর তেলের সান্দ্রতা নির্ভর করে। অণুতে কার্বনের শৃঙ্খল যত বড় হয়, তেলের স্ফুটনাংক তত বাড়ে, সান্দ্রতাও তত বেশি হয়। এই 'সান্দ্রতা' ধর্মের ওপর ভিত্তি ক'রে লুব্রিকেটিং তেলকে আবার হাল্কা, মাঝারি ও ভারি—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন রকম যন্ত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডের লুব্রিকেটিং তেল, যন্ত্রাদি পিচ্ছিল করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘড়ির 'কগ-হুইল', স্টীম ইঞ্জিন, জাহাজের ইঞ্জিন প্রভৃতি সকল যন্ত্রেই পিচ্ছিলকারক তেল বা লুব্রিকেটিং তেল ব্যবহার করতে হয়। তা না করলে যন্ত্রের ঘর্ষণজনিত ক্ষয় রোধ করা যায় না।

**ভেসেলিন ঃ**

'ভেসেলিন' নরম জেলির মতো পদার্থ। এর গলনাংক 38°C থেকে 60°C এর মধ্যে হ'য়ে থাকে। নানা রকম মলম ও প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করতে ভেসেলিন ব্যবহৃত হয়।

**তরল ও কঠিন প্যারাফিন ঃ**

স্বচ্ছ ও বর্ণহীন তরল প্যারাফিন 'জোলাপ' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া নানা রকম প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতিতেও তরল প্যারাফিন ব্যবহৃত হয়।

কঠিন প্যারাফিনের সঙ্গে সাধারণত অনেকটা তরল প্যারাফিন থেকে যায় বলে তা বেশ নরম হয়। নরম হয় বলে তা দিয়ে মোমবাতি তৈরি করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য কঠিন প্যারাফিনকে প্রথমে খুব ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে গরম করা হয়। তখন

তার থেকে তরল প্যারাফিন ঝরে পড়ে। এইভাবে কঠিন থেকে তরল প্যারাফিন পৃথক করার পদ্ধতির নাম 'সোয়েটিং প্রক্রিয়া'। 'সোয়েটিং প্রক্রিয়া'য় পাওয়া কঠিন প্যারাফিন বাদামী রঙের হয়। একে গলিয়ে অঙ্গারচূর্ণের মধ্যে ফেললে অঙ্গারচূর্ণ রঙ শুষে নেয়। তারপর বর্ণহীন কঠিন প্যারাফিনকে উত্তপ্ত অবস্থায় ছেঁকে নিলে সাদা রঙের কঠিন প্যারাফিন পাওয়া যায়। এ দিয়ে মোমবাতি, ওয়াটারপ্রুফ, কাগজ, জুতার পালিশ ইত্যাদি তৈরি হয়।

**অ্যাসফাল্ট ঃ**

আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় ক্রুড পেট্রোলিয়মের সব উদ্বায়ী অংশ পৃথক ক'রে নেবার পর পাতন পাত্রে কালো রঙের যে আঠালো পদার্থ পড়ে থাকে, তারই নাম 'অ্যাসফাল্ট'। এ দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়, ফুটো বা ফাটা ছাদ মেরামতির কাজেও এ জিনিসটি ব্যবহৃত হয়।

**পেট্রোলিয়ম কোক ঃ**

ক্রুড পেট্রোলিয়মের ক্র্যাকিং ও অন্তর্ধূম পাতন (বায়ুর অনুপস্থিতিতে উচ্চতাপে পাতন) প্রক্রিয়ার সময় পাতন পাত্রে উপজাত পদার্থরূপে পড়ে থাকে 'পেট্রোলিয়াম কোক'। এই পদার্থটি প্রধানত জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য কাজেও লাগে। অনেক ধাতু শোধন করতে, ক্যালসিয়াম কার্বাইড উৎপাদন করতে এবং উচ্চতাপ সহনশীল পদার্থ প্রস্তুত করতে পেট্রোলিয়ম-কোক-এর প্রয়োজন হয়।

সংশ্লেষিত জৈব যৌগের কাঁচা মালের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার হলো পেট্রোলিয়ম। শতকরা 90টি জৈব যৌগই আজকাল পেট্রোলিয়ম থেকে সংশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ ক্রুড তেল উৎপাদন করা হয় তার মধ্যে মাত্র 8 ভাগ পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকিটা ব্যয়িত হয় শক্তি রূপে।

মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, ইথিলিন, প্রোপিলিন, বিউটিলিন, বেঞ্জিন, জাইলিন ইত্যাদি সরল হাইড্রোকার্বনগুলি থেকেই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার পেট্রোকেমিক্যাল প্রস্তুত করা হয়।

পেট্রোলিয়মকে শোধন ক'রে পাওয়া যায় 'প্রোপিলিন'। 1918 খ্রীষ্টাব্দে 'কার্লেটন ইলিস' নামে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী প্রোপিলিন থেকে 'আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহল' প্রস্তুত করেন। আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহলই প্রথম পেট্রোকেমিক্যাল—যা সংশ্লেষিত হলো।

এরপর আমেরিকার E. I. du pont de Nemours & Co. পেট্রোলিয়ম থেকে প্রস্তুত করলেন 'টেট্রাইথাইল লেড' ( T.E.L )। তারপর পেট্রোলিয়ম থেকে একে একে সংশ্লেষিত হলো মেথানল, অ্যাসিট্যালডিহাইড ও ফরম্যালডিহাইড। বেঞ্জিন থেকে সংশ্লেষিত হলো স্টাইরিন, প্রোপিলিন থেকে অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল, স্টাইরিন থেকে পলিস্টিরিন, ক্লোরোবেঞ্জিন থেকে ডি. ডি. টি., অ্যানিলিন থেকে অ্যাজো রঙ ; ডাইমিথাইল টেট্রাথ্যালেটের এবং ইথিলিন গ্লাইকল থেকে সংশ্লেষিত হলো পলিয়েস্টার তন্তু।—এমনি অজস্র পেট্রো-কেমিক্যাল আজ পর্যন্ত সংশ্লেষিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও কতো যে সংশ্লেষিত হবে তার ইয়ত্তা নেই।

রাসায়নিক সংশ্লেষণ পদ্ধতির একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বিষয়টা তাহলে আরও পরিষ্কার হবে।

পেট্রোলিয়ম থেকে পাওয়া যায় 'প্রোপিলিন।' অ্যাসিড অনুঘটকের উপস্থিতিতে প্রোপিলিনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া ঘটালে তৈরি হয় 'প্রোপান-2-অল' যৌগ। এই যৌগটিকে আবার ধাতব অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনমুক্ত করলে পাওয়া যায় 'অ্যাসিটোন'।

$$\text{প্রোপিলিন} + \text{জল} \xrightarrow[\text{অনুঘটক}]{\text{অ্যাসিড}} \text{প্রোপান-2-অল}$$

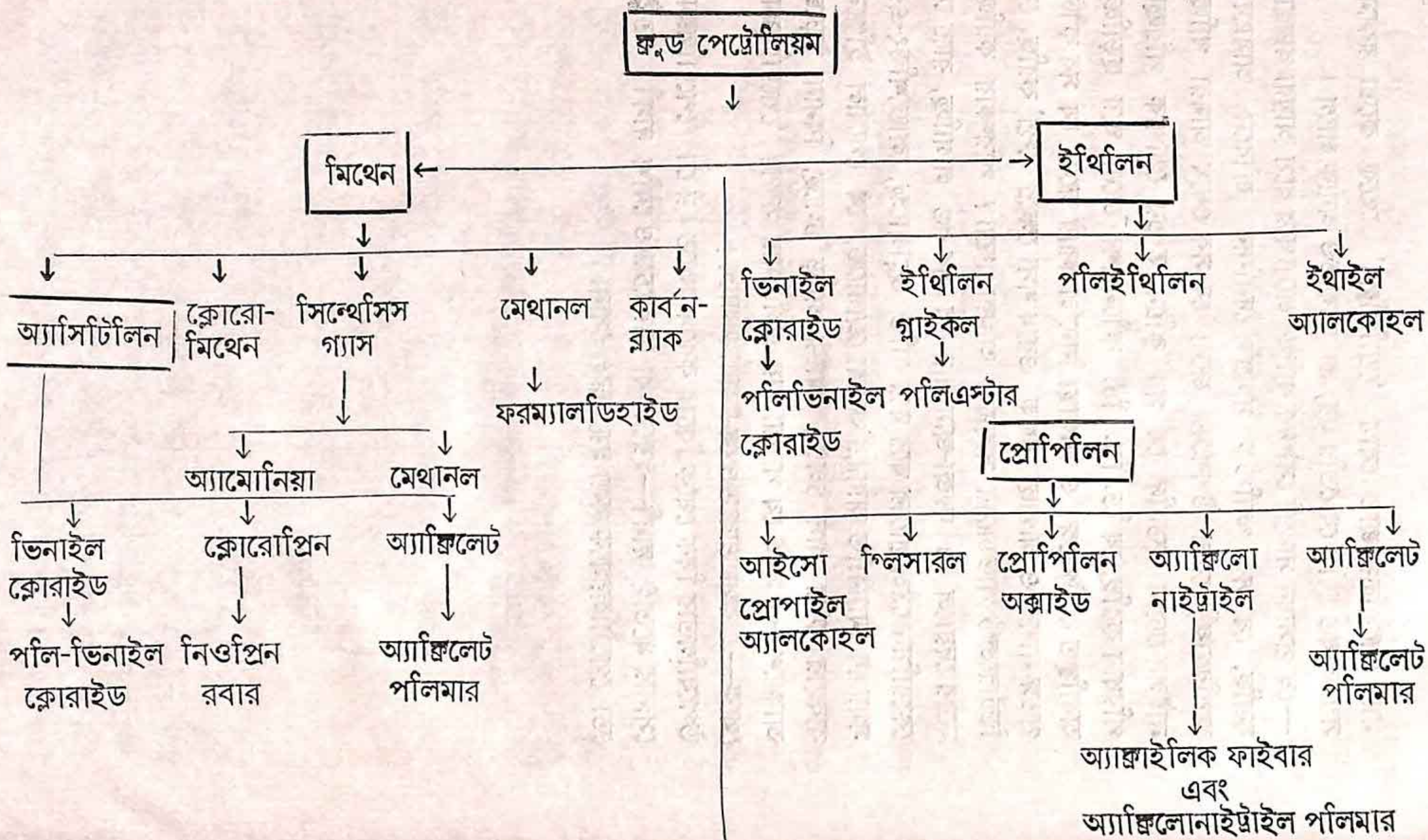
$$\text{প্রোপান-2-অল} \xrightarrow[\text{অনুঘটক}]{\text{ধাতব}} \text{অ্যাসিটোন} + \text{হাইড্রোজেন}$$

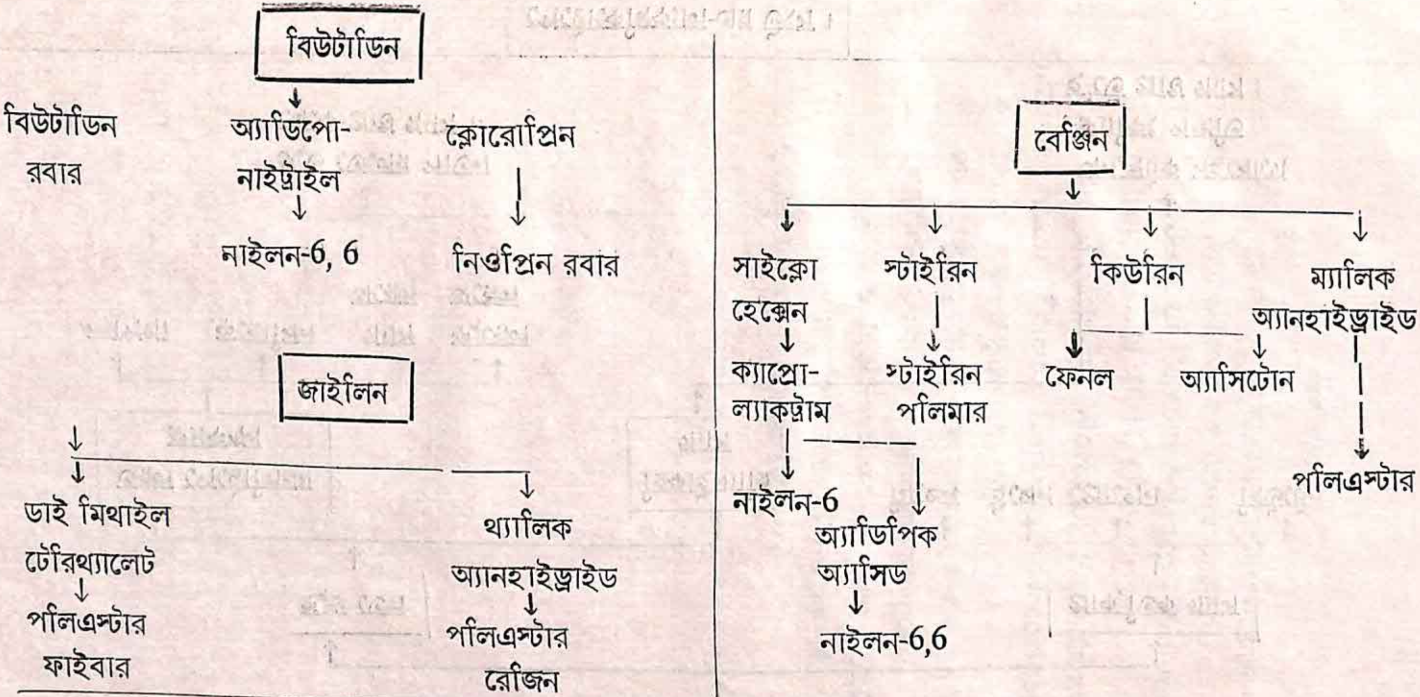
'অ্যাসিটোন' কিটোন গোষ্ঠীর জৈব যৌগ। এটি একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক। অ্যাসিটোন থেকে আবার নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা যায় হেক্সিলিন, গ্লাইকল, ডাই অ্যাসিটোন অ্যালকোহল, মেসিটাইল অক্সাইড ও মিথাইল আইসোবিউটাইল কিটোন।—এই যৌগগুলি নানারকম পেইণ্ট ও ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়—একটি

মাত্র পেট্রোলিয়মজাত যৌগ 'প্রোপিলিন' থেকে কতো রকমের সংশ্লেষিত যৌগ যে তৈরি হয়, তা ভাবতেও অবাক লাগে।

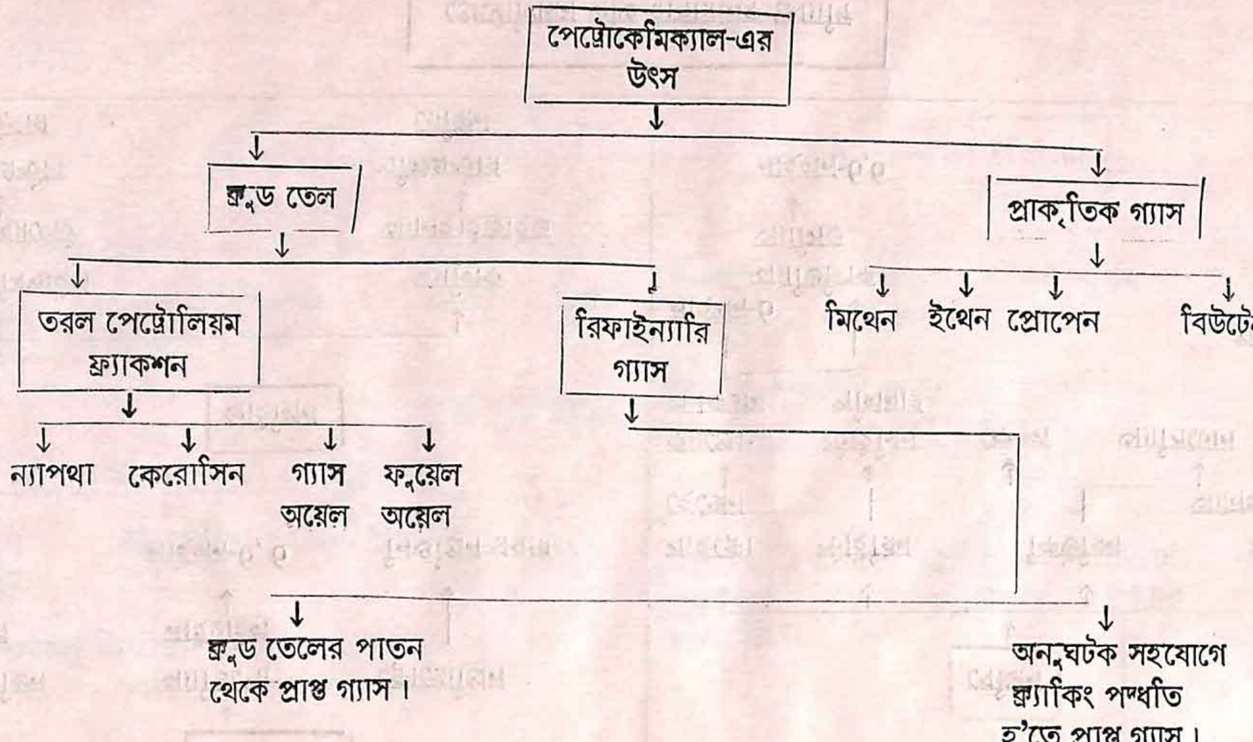
—যে প্রসাধন সামগ্রী সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে ঘরে বসে আমরা ব্যবহার করছি, যে সব প্লাস্টিক সামগ্রী দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অপরিহার্য, রোগ উপশমের জন্যে যে সব ওষুধ আমরা খাচ্ছি, নাইলন-ডেক্রন ইত্যাদি যে সব কৃত্রিম তন্তুর পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করছি, যে ডি. ডি. টি. কীটনাশের জন্যে ঘরে ছড়াচ্ছি, অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ ও আগাছা নির্মূল করার জন্যে যে সব কীট-পতঙ্গ নাশক ও আগাছা নাশক ওষুধ শস্য ক্ষেত্রে 'স্প্রে' করছি, যে ডিটারজেন্ট পাউডারের সাহায্যে আমরা বস্ত্রাদি পরিষ্কার করছি, ঘরের দেয়ালে ও দরজা-জানালায় যে সব রঙ লাগাচ্ছি, রাত্রে যে কেরোসিন তেল গ্রামের ঘরে ঘরে বাতি জ্বালাচ্ছে, লোডশেডিং-এর সময় যে মোমবাতি আঁধারে আলো জোগাচ্ছে, যে পেট্রোল ইঞ্জিনে ব্যবহার ক'রে বাস চলছে, মোটর গাড়ি চলছে, বিমান উড়ছে আকাশে—এ সবই যে পাওয়া যায় একটি মাত্র সম্পদ 'পেট্রোলিয়ম' থেকে—এ কথা ভাবতেও যেন অবাক লাগে!

উপযোগিতার দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে 'পেট্রোলিয়ম' সোনার মতোই দামী—হয়তো বা তার চেয়েও বেশি দামী। তাই তো পেট্রোলিয়মকে বলা হয় 'তরল সোনা।'


ক্রুড পেট্রোলিয়ম
মিথেন
ইথিলিন
অ্যাসিটিলিন
ক্লোরো-মিথেন
সিন্থেসিস গ্যাস
মেথানল
কার্বন-ব্ল্যাক
ফরম্যালডিহাইড
অ্যামোনিয়া
মেথানল
ভিনাইল ক্লোরাইড
পলি-ভিনাইল ক্লোরাইড
ক্লোরোপ্রিন
নিওপ্রিন রবার
অ্যাক্রিলেট
অ্যাক্রিলেট পলিমার
ভিনাইল ক্লোরাইড
পলিভিনাইল ক্লোরাইড
ইথিলিন গ্লাইকল
পলিএস্টার
পলিইথিলিন
ইথাইল অ্যালকোহল
প্রোপিলিন
আইসো প্রোপাইল অ্যালকোহল
গ্লিসারল
প্রোপিলিন অক্সাইড
অ্যাক্রিলো নাইট্রাইল
অ্যাক্রাইলিক ফাইবার এবং অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল পলিমার
অ্যাক্রিলেট
অ্যাক্রিলেট পলিমার




প্রেট্রোলিয়ম জাত রাসায়নিক দ্রব্যাদি




পেট্রোকেমিক্যাল-এর উৎস ।

## —ঋণ স্বীকার—

এই গ্রন্থ রচনায় যে সব পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি—গ্রন্থকার সহ তাদের নাম নিচে কৃতজ্ঞতা সহ উল্লেখ করলাম।

1. The Book of Popular Science—Volume-4
2. Petroleum—H. P. H. Oliver
3. The Wonderful World of Petrochemicals—Sukumar Maiti—Science Reporter—December, 1974
4. পেট্রোলিয়ম—মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
5. মানব কল্যাণে রসায়ন—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
6. পেট্রোলিয়ম শোধনাগার—মাধবেন্দ্রনাথ পাল
   জ্ঞান ও বিজ্ঞান—আগস্ট-সেপ্টেম্বর, 1954.
7. Understanding Science—Volume—4
   Chief Editor : Leslie Basford.